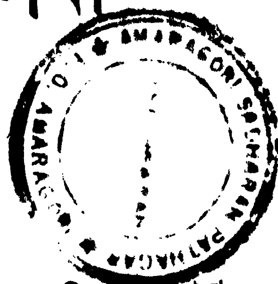
প্রেম ও সেবা



সর্গের সন্ধান’, ‘কলির গান’, ‘অমৃতকথা’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মজুমদার

বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত



প্রকাশক—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ,

শিশির পাবলিশিং হাউস

১৯৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ

শিশির প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৯নং গৌরমোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট,

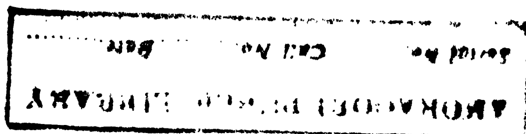
কলিকাতা।

উৎসর্গ

দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত জীবন, পরম সারস্বত

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু



ভূমিকা

চটুল সাহিত্যে প্লাবিত, রাষ্ট্রনীতিক দ্বন্দ্বসংঘর্ষে মুহ্যমান দেশে, রঙ্গমঞ্চের সমারোহে অভিভূত সমাজে, ক্রীড়াকৌতুকরসে প্রমত্ত এই নাগরিক জীবনে প্রেম ও সেবাধর্ম্মের বাণী কে শুনিবে? পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসবের দিনে আজ চারিপাশে চাহিয়া দেখি—হয় জড়তার অবসাদ, নয় জড়বাদের ভোগমত্ত আড়ম্বর। জড়তা তমোগুণের ক্রিয়ার ফল। ভোগমত্ত আড়ম্বরের আস্ফালন—রজোগুণের পরিস্ফূর্ত্তি। যে সত্ত্বমহিমার অপূর্ব্ব বিভূতি পরমহংসদেব এই হতভাগ্য দেশে সঞ্চার করিয়া গেলেন প্রেম-ধর্ম্মপ্রচারে, যাহার লৌকিকজগতে বিনিয়োগ দেখাইয়া গেলেন তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ স্বামী সেবাধর্ম্মের বিস্তারে, তাহার স্থান আজ কোথায়? এই কথার উত্তর দিতে গেলে বেদনায় কণ্ঠ নীরব হয়, নয়ন নীরবে অশ্রুপাত করে,—হৃদয় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

এই গ্রন্থকার এ বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া প্রেম ও সেবাধর্ম্মের ঋষি পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী বৎসরে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলেন। পরমহংসদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আর কি আছে? যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষগণ যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন—যে বাণী চরম শক্তি ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরের পূজারী

ব্রাহ্মণের ভাবগম্ভীর কণ্ঠে, সেই বাণীর ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকার একাধারে ভারতীয় সাধকসংঘের সেবা করিয়াছেন ও পারমার্থিক তৃষ্ণায় আর্ত্ত ভক্তগণের হৃদয়ে প্রেমামৃত সেচন করিয়াছেন।

প্রেম ও সেবাধর্ম্মের বাণী কে শুনিবে? কাহারা শুনিবে তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া কোন বাণীর প্রচার বা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। পাশবিকতার দ্বারা আমাদের জীবন যতই আচ্ছন্ন হউক—মানবিকতা তিরস্কৃত হইতে পারে, বহিষ্কৃত হয় নাই। সকলেরই জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন এই বাণী শুনিতে আগ্রহ জন্মে। লেখক সেই ভরসায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন।

প্রেম ও সেবাধর্ম্মের বাণীর ব্যাখ্যা তত্ত্বোপদেশমূলক হওয়াই স্বাভাবিক,—হইয়াছেও তাহাই। বলা বাহুল্য ইহা সাহিত্য নয়। লেখক তাঁহার কথাগুলিকে যতদূর সম্ভব সরস করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তত্ত্বকথা 'কান্তাসম্মিত' ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইতে পারে না—বিশ্ববরেণ্য মনীষিগণ ও সাধকগণ ইহাকে 'প্রভুসম্মিত' ভঙ্গীতেই প্রকাশ করিয়াছেন—লেখকের সাহিত্যিকতা, প্রাজ্ঞতা বা সাধকতার অভিমান নাই। তিনি ইহাকে 'মিত্রসম্মিত' ভঙ্গীতেই বিবৃত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রেম ও সেবাধর্ম্মের মহিমা তিনি বহুবিধ যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

তত্ত্বলোক যাহাতে দুরারোহ ও দুরধিগম্য বলিয়া মনে না হয়, সেজন্য লেখক যুক্তির সোপানে সোপানে হাত ধরিয়া পাঠককে

প্রেম ও সেবার মন্দিরে তুলিবার সহায়তা করিয়াছেন। অপরকে ধন্য করিবার জন্য নয়,—আপনারই ঐহিক ও পারমার্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য, এই বাণীর অনুসরণ প্রয়োজন, লেখক তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কস্তুরীমৃগ জানে না তাহার নাভিই সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, সে পাগল হইয়া বনে বনে গন্ধের জন্মস্থান খুঁজিয়া বেড়ায়—সেই কস্তুরী মৃগকে সৌগন্ধ্যের প্রকৃত সন্ধান বলিয়া দিলে যে মৈত্রী ধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়—এই গ্রন্থের দ্বারাও তাহাই হইবে বলিয়া মনে করি।

অনেকে বলিবেন—এসকল কথা ত আমরা জানি। বিশেষতঃ ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের এ জ্ঞান সম্বন্ধে অভিমান থাকা বিচিত্র নয়। লেখক তাঁহাদের সেই জ্ঞানকে যুক্তিমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত ও হৃদয়াবেগের সংযোগে নিবিড়ায়িত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া উচিত। যাঁহারা দেশসেবার গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া নানাভাবে কেবল আত্ম-সেবাই করিতেছেন, এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের একজনের মনেও যদি সেবাধর্ম্মের মহান্ আদর্শ বিজয়শ্রী লাভ করে, তাহা হইলে গ্রন্থকারের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

মায়াচক্রে ঘূর্ণমান মানবচিত্ত সুখের সন্ধানেই ভ্রমণ করিতেছে —যৌবন এই সুখের সন্ধানের প্রকৃষ্ট কাল। যৌবনে দেহে মনে বল থাকে অক্ষুণ্ণ, তরুণ চিত্ত তাই কাহারও আদেশ উপদেশাদি শুনিতে চায় না—নিজের শক্তির উপর তাহার

গভীর বিশ্বাস, আত্ম-শক্তিবলেই সে সুখের উৎস সন্ধান করিতে চায়। প্রৌঢ় জীবন সংশয়ের কাল,—নানা পথে নানাভাবে প্রবঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হইয়া প্রৌঢ়গণের কিছুতেই বিশ্বাস থাকে না। প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিলেই মানুষ একটা স্থায়ী আশ্রয় পায়, সে পরিভ্রমণে ক্লান্ত, অভিজ্ঞতা ভারে তাহার চিত্ত ভারাক্রান্ত, সংশয়-পরম্পরাকেও সে মায়া বলিয়া মনে করে। সে তখন জিজ্ঞাসা করে—কিসে অনাবিল অবিমিশ্র সুখ তাহাই বলো—সবই দেখিলাম, কিছুতে সুখ নাই—পরিণামে সবই বিরস ও আর্ত্তিময়। তাহাকে যে বাণী শুনাইতে হইবে তাহারই ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে আছে। প্রেম ও সেবা ছাড়া অন্য কিছুতে অনাবিল পরিণাম-মঙ্গল সুখ নাই—নাই—নাই।

প্রকৃত সুখের সন্ধান লাভ করিতে হইলে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু হায়, তখন যে দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তখন সন্ধান পাইয়াও লাভ নাই। প্রকৃত সুখের তত্ত্ববাণীকে কর্ম্মে পরিমূর্ত্ত ও জীবনে পরিস্ফূর্ত্ত করিবার আর অবসর নাই। প্রত্যেক বৃদ্ধই বলিবে—আহা, যদি এ জ্ঞান যৌবনে হইত—তাহা হইলে জীবনটা ব্যর্থ হইত না।

প্রকৃত সুখের সন্ধান মিলে প্রেম ও সেবায়—এই বাণী বৃদ্ধেরাই সাগ্রহে শুনিবে। কিন্তু এই বাণী শুনিয়া বৃদ্ধ যখন আক্ষেপ করিবে, তখন সে বাণী শুনিবে কে? সে বাণী শুনিবার কথা যুবকদেরই। এই আক্ষেপ-বাণীকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সুখের সন্ধান করিতে হইবে যুবকদের। বহু বৃদ্ধের

আক্ষেপবাণী ঘনীভূত হইয়া আছে—এই গ্রন্থে। আমার তাই মনে হয়, এই গ্রন্থ যুবকদের জন্য রচিত। যাহাদের হৃদয় আজও সরস, সংসারের পঙ্কিলতায় যাহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় নাই, যাহারা মুহুর্মুহু প্রবঞ্চিত হইয়া সংশয়বাদী হইয়া উঠে নাই প্রেমধর্ম্মে অধিকার তাহাদেরই। যাহাদের দেহে মনে শক্তি সাহস উৎসাহ এখনও অটুট, যাহারা এখনও আত্মবিস্মৃত হইতে জানে, মহান আদর্শকে যাহারা পূজা করিতে ইতস্ততঃ করে না—সেই যুবকদের অধিকার সেবাধর্ম্মে।

আমি প্রত্যাশা করি, উদারহৃদয় যুবকগণ এই গ্রন্থ হইতে প্রেম ও সেবা ধর্ম্মে প্রেরণা লাভ করিবে।

রসচক্র

৩রা চৈত্র, ১৩৪৩ শ্রীকালিদাস রায়

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

সূচনা

জাগতিক সুখদুঃখের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানুষ আপাতমধুর সুখে মত্ত হইয়া প্রকৃত সুখের সন্ধান কোনকালেই পায় না। তাহারা ক্ষণকালের জন্যও ভাবিয়া দেখে না যে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে হইলে সাধারণ পথ হইতে স্বতন্ত্রপথে চলিতে হইবে। এই স্বতন্ত্রপথের পাথেয় হইবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে হিংসা-দ্বেষ দ্বন্দ্ব-কলহাদির স্থান বিন্দুমাত্রও নাই। বাহিরে বৈরাগ্যের নামাবলী গায়ে দিয়া অন্তরে কালবিষ পোষণ করিলে কখনও আত্মার তৃপ্তি সাধন করা যায় না। আত্মার তৃপ্তি সাধন না করিলে প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করা সম্ভবপর নহে। জগতের সকল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, কেবলমাত্র প্রেম ও সেবা দ্বারাই আত্মার তৃপ্তি সাধন করা সম্ভব। যিনি নিঃস্বার্থভাবে প্রেমময় ও সেবাপরায়ণ হ'ন, তিনিই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

এই মধুর প্রেম ও সেবাধর্ম্মের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। এই পথের পথিককে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় ও বহু প্রলোভন জয় করিতে হয়।

এই পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই সুখের অন্বেষণে ভুলপথ ধরিয়া চলিয়াছে। কেহ বা ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত,

কেহ বা কীর্ত্তিলাভের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু জীবনের পূর্ণতালাভ করিয়া পরমপ্রেমময়ের পাদমূলে আত্মোৎসর্গ করিবার মহতী প্রচেষ্টা হইতে প্রায় সকলেই বিরত । আধুনিক যন্ত্রচালিত সভ্যতা দিন দিন আমাদিগকে আত্মসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী লোক শিক্ষক অবতারগণ পরিপূর্ণ জীবনের নীতি ও শক্তির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নানা উপায়ে অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঐ নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জীবন-পথে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

প্রেম ও সেবাধর্ম্মের এই মধুময় নীতিনিচয় যে ব্যক্তি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় উহার প্রভাব প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই অবিদ্যার কঠোর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজের জীবনকে মধুময় ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিবেন।

পরিশেষে নিবেদন, যদি একটি মাত্র পাঠক ও অথবা পাঠিকা এই পুস্তক অধ্যয়নে প্রেম ও সেবাধর্ম্মের পুণ্যপ্রভাব উপলব্ধি করিয়া স্বীয় জীবন প্রেমময় ও সেবাপরায়ণ করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই গ্রন্থকার তাহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে।'

প্রেম ও সেবা

—০※০—

—জীবন-পথে—

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে নবীন অরুণালোকে উদ্ভাসিত নবোদ্ভিন্ন জীবনের মহামহোৎসবে যে দিন সমস্ত জগৎ মুখরিত, সোণার কাঠির স্পর্শে যে দিন অচেতন জড়ে চৈতন্য সঞ্চার হইল, যাহা কিছু অচঞ্চল নিঃস্পন্দ ছিল, সবই চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমস্ত জীবলোক নববলে বলীয়ান্ হৃদয়ের ভাবাবেশে অপ্রতিহত বেগে দিকে দিকে অভিযান সুরু করিল, সেই সময়-কার এক শুভ পুণ্যাহে অনন্ত নীল চন্দ্রাতপতলে জগৎসভায় দাঁড়াইয়া বজ্রনির্ঘোষ-কণ্ঠে মানুষ প্রচার করিয়াছিল—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

সে দিন হইতে আরম্ভ করিয়া চলমান জগতের ক্রমবিকাশের পথে অদ্যাবধি মানুষের সমস্ত কার্য্যকলাপের অন্তরালে, তাহার সমাজ-গঠনের আদিপর্ব্ব হইতে মেরু-প্রদক্ষিণ-পর্ব্ব এবং অভ্রভেদী হিমগিরির তুঙ্গ শৃঙ্গারোহণ-পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় অলৌকিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে ঐ এক মহামন্ত্র ধ্বনিত

হইতেছে—"আমাকে বাঁচিতে দাও, সুন্দর ভুবনে।" মানুষের হৃদয়-বীণার প্রতি তারে, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে ছয়রাগছত্রিশরাগিণী-সংবলিত যে বিচিত্র অপূর্ব্ব আনন্দরসসিক্ত মূর্চ্ছনা বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল প্রেরণা ঐ শাশ্বতী বাণীর মধ্যে—"আমাকে বাঁচিতে দাও।" শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি রস-জীবনের প্রত্যেক অভিব্যক্তিতে মানুষ মৌন ভাষায় বলিতে চাহিয়াছে 'আমাকে বাঁচিতে দাও।"

বস্তুতঃ যদিও মানুষ প্রাণের গভীর আবেগে বলিতে পারিয়াছে—"আমি বাঁচিতে চাই,"—কিন্তু বাঁচিবার উপায় কি সে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। "Live and let Live"—অর্থাৎ আমাকে বাঁচিতে হইলে যে অপরকে বাঁচিতে দিতে হইবে,—এই একান্ত সত্য কথাটি মানুষ ভুলিয়াছে বলিয়াই আজ মানুষের এত দুঃখ। আজ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে অশান্তির দাবানল ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা মানুষের আত্মবিস্মৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

বাঁচিবার এই অত্যুগ্র বাসনায়, সংসারে অমৃতত্ব লাভের প্রত্যাশায় মানুষ, জীবনসমুদ্র মন্থনে ব্যাপৃত হইয়াছিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অপরকে মারিয়া নিজে বাঁচিবার এই—সর্ব্বনাশী স্বার্থপরতার দ্বারা সে আবিষ্ট হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তার পতন ঘটিল। অমৃতের পরিবর্ত্তে সে পাইল হলাহল, সুখের পরিবর্ত্তে তাহার ভাগ্যে ঘটিল দুঃখ। আপন ঐহিক ঐশ্বর্য্যের গরিমার প্রতীক-স্বরূপ মানুষ কতই না ইট পাথরের কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়িয়া

তুলিয়াছে, দেবতা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ অজস্র অর্থব্যয়ে কত বিরাট বিশাল মঠমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার নিভৃত অন্তরে দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-ভক্তি ও প্রেম দিয়া শুচিসুন্দর দেবালয় সে গড়িয়া তুলিতে পারিত, মোহান্ধ মানুষ তাহার সন্ধান পায় নাই। সে বহির্জগৎ লইয়াই উন্মত্ত, ভিতরের দিকে চাহিবার অবসর তাহার হয় নাই। আজ পৃথিবীর এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ মানুষের সেই মহা অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের সূচনা মাত্র।

সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও তাহার অহমিকার যূপকাষ্ঠে তৎসমস্তই বলি দিয়াছে, ছিন্নমস্তার মত স্বীয় শিরশ্ছেদনে লালসাময়ী রসনায় স্বীয় রুধির ধারা পান করিয়া তাহার বিশ্বগ্রাসিনী লোভতৃষ্ণা মিটাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু মিটিয়াছে কি? আত্মসুখের চরিতার্থতা সাধনে সে যে কুহকিনী মরীচিকার পশ্চাত ছুটিয়াছে, তাহা তাহার শান্তির কারণ হইয়াছে কি? অন্তরের অন্তরালে যে প্রেম-প্রদীপ বিধাতা নিজহস্তে জ্বালিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই সে সেই আলোকের সন্ধান পায় নাই।

সুখের মোহে ভুলিয়া মানুষ যখনই দুঃখের পশরা মাথায় লইয়াছে, অমৃতের অধিকারী হইয়াও যখনই সে বিষপাত্র পান করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সৌভাগ্যবশতঃ জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষগণ মানুষের দুঃখে বিগলিত হইয়া ‘সম্বর, সম্বর’—রবে

আমাদের কাণের কাছে আসিয়া বলিয়াছেন—"ওরে তোরা থাম্ থাম্। বাঁচবার আশায় তোরা ভুলপথ ধ'রে চলেছিস্, এ ধ্বংসের পথে আর পা বাড়াস্‌নে. এ পথে তোরা বাঁচবিনে, নিজে বাঁচতে চাস্ তো অপরকে বাঁচতে দে।" তখনই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই ভগবান্ শ্রীবুদ্ধ মৈত্রীর বাণী লইয়া আসিয়া বলিয়াছেন—

"মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্ষে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।"

অর্থাৎ মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজ পুত্রকে রক্ষা করেন, এই রূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। মানুষ-মানুষে বৈষম্যের ভাব বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে এক অখণ্ড প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য বীর সাধক বলিয়াছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানুষ তাহার সমস্ত সদ্‌গুণের আদর্শ আশ্রয়স্বরূপ স্বর্গ-রাজ্যের পরিকল্পনা করিয়াছে। প্রেম ও সেবার দ্বারা মানুষ যে ইহলোকেই স্বর্গ রচনা করিতে পারে, সংসারকে শাশ্বত শান্তির অমরাবতী করিয়া তুলিতে পারে, সে কথা আজ তাহাদের উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে। সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে যে প্রতিবেশীকেও সমান সুখ-সুবিধা দিতে হইবে, একের হিতে যে সকলের হিত, আর সকলের কল্যাণেই যে নিজের কল্যাণ, এই কথা আজ আমাদের ভুলিলে চলিবে না।



মানুষের মনুষ্যত্ব-লাভের পথে প্রেম ও সেবা-পরায়ণতার মত মহাধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। সত্যের পথে, সুন্দরের পথে, কল্যাণের পথে যাহারা যাত্রী, প্রেম ও সেবাই তাহাদের পথের সম্বল পাথেয়।

মানুষের অন্তরাত্মায় সর্ব্বযুগে এই প্রশ্ন প্রবুদ্ধ হইয়াছে—

জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভের মূলমন্ত্র কি? কোন নীতির উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করিলে, হৃদয়ে কোন শক্তির প্রত্যক্ষ সাধন করিলে জীবন শিবসুন্দর স্বর্গীয় সম্পদে সমৃদ্ধ ও সর্ব্ব-বন্ধন মুক্ত হয়? এই চিরন্তন প্রশ্নের সমাধান কোথায়?

ইহার যথার্থ চরম উত্তর পাইবার জন্য, আপনার মাঝে এই মন্ত্র উপলব্ধি করিবার জন্য কত সহস্র-সহস্র মহাপ্রাণ তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছেন, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" পণ করিয়া কত বীর হৃদয় নিঃসঙ্কোচে, সেই চিন্তা-মাণিকের সন্ধানে কাল-বারিধি-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন।

বস্তুতঃ জীবনের পরিপূর্ণতার সেই মূল নীতিটির সহিত পরিচয় লাভ ঘটিলে মানুষের ঐ চিরন্তন প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান হয়। জীবনকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার বা পরিপূর্ণ ভাবে অধিগত করিবার পথও সুগম হয়। এই একটী মাত্র মূল নীতিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে, মানুষের জীবন চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে, কত স্বর্গীয় সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া অমৃতের পথে ধাবিত হয়, জীবন কেমন সুন্দর শিবময় এবং সুষমা-মণ্ডিত

হইয়া উঠে, কত অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইয়া মানুষকে ধরায় নন্দনের সন্ধান দেয়।

সেই মূল নীতির যে যতখানি আপনার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহার ব্যক্তিগত জীবন ততখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে। তখন আর বলা চলিবে না—

Have I not reason to lament
What man has made of man?

(Wordsworth)

তখন আর এই কথা বলা চলিবে না, যে মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিকতাই ধরার বুকে দুঃখদৈন্য হাহাকারের সৃষ্টি করিয়াছে।

আমি এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহার জীবনে পূর্ব্বে কোন লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু পরে একদিন এই নীতি গ্রহণ করিয়া লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনে তদনুযায়ী কাজ করিয়া জীবনকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই একটী নীতির অভাবে হয়ত তাঁহার জীবন বিফল হইয়া যাইত, পৃথিবীর বুকে তাঁহার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই থাকিত না, অথচ সৌভাগ্যক্রমে সেই নীতির পুণ্যোজ্জ্বল প্রভাবই তাঁহার জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। আবার এমনও দেখিয়াছি, যাহারা অহরহঃ সুখের সন্ধানে ভ্রান্ত পথ ধরিয়া চলিয়াছে তাহারা জীবনের মূল নীতির অভাবে বিপথগামী হইয়া নিরাশার ঘনান্ধকারে আলেয়ার পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই নীতির অভাব বশতই সমাজ আজ শৃঙ্খলা ও সৌষম্য হারাইয়াছে, মহিলারা আজ বিলাস-ব্যসনে মত্ত, যেন জীবনে অন্য কোন উচ্চতর আদর্শ নাই। সংসারে আসল নকলের মূল্য বা গুরুত্ব পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহারা দেখিতে পান যে, আজ যাহা তাঁহাদের কাম্য তাহা কত ক্ষণভঙ্গুর, দয়া-প্রেম-সেবা ইত্যাদির তুলনায় তাঁহাদের মিথ্যা বিলাস-ব্যসন খাঁটী কাঞ্চন-খণ্ডের কাছে তাম্র-খণ্ডের ন্যায় নিষ্প্রভ, শুভ্র হীরক-খণ্ডের কাছে কাচ-খণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ ও নগণ্য। 'মুকুতার বদলে শুক্তা' লইয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে।

সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে জীবনকে একটী বিশিষ্ট আদর্শের ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে, আদর্শ-বিহীন জীবন পশুজীবনেরই সমান। কর্ণধার-বিহীন নৌকার মতই আদর্শ-বিহীন জীবন সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে পর্য্যুদস্ত হয় এবং অনতিবিলম্বে কাল-গর্ভে প্রবেশ করে। জীবনের এই আদর্শ.—পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের এই মূল নীতি,—প্রেম ও সেবার মধ্যে নিহিত। এই দুইটী ধর্ম্ম এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত ও অনুস্যূত যে একটীকে অপরটী হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। যেখানে প্রেম সেখানে সেবাও বিদ্যমান। হেনরী ড্রুমণ্ড [Henry Drummond] তাঁহার একটী সুন্দর গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন 'প্রেমই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।' তোমার অন্তরে কি এই পরম সম্পদ আছে? যদি থাকে তার প্রমাণ কি? কি ভাবে তোমার প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইবে?

তোমার চতুর্দ্দিকের ঐ শত সহস্ররূপে বিচিত্র ভাবে যাহারা তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহাদের প্রতি করুণায় ? অপরিমেয় দয়ায় ? অক্লান্ত সেবায় ? যদি তাহাই হয় তবে সাধুবাদ দিয়া বলিব তোমার ভিতর যথার্থ প্রেম আছে। যদি তাহা না হয়, তবে তোমার প্রেমে আমার সন্দেহ করিবার যথেস্ট কারণ আছে ! আমি মনে করিব তুমি প্রেমকে অন্য কিছু বলিয়া ভুল করিতেছ।

বাস্তবিক পক্ষে সেবা ব্যতীত অপরের দুঃখ-বিমোচনের প্রতিকার ব্যতীত, অপরের প্রতি প্রেমের নিদর্শন কোথায় ? প্রেমের একমাত্র পরীক্ষাই সেবা। সাহায্য, সহানুভূতি, দয়া, সেবা, প্রেমেরই প্রকাশ, এ সমস্ত প্রেমের বহিরঙ্গীয় স্বরূপ, প্রেম যদি এসব কর্ম্মময় স্বরূপ প্রাপ্ত না হয়, তবে সে প্রেম ভীরু, দুর্ব্বল, রুগ্ন মনেরই মিথ্যা ভান মাত্র; তাহাকে সবল, সুস্থ, ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিতে হইবে সাধনার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা এবং এই ভাবেই সেই প্রেমকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক দিকে প্রয়োগ করিতে হইবে। তবেই আমাদের জীবন হইবে পরিপূর্ণ জীবন !

প্রকৃতির রাজ্যে একটা প্রধান নিয়ম এই যে—যাহা জগতের কোন কাজে লাগে না, যাহা দ্বারা জগতের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তাহা আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়, আপনা হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যজীবনের মূলেও সেই একই নীতি বিদ্যমান। যে আপনাকে জগতের কল্যাণে বিলাইয়া দিতে না পারে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনটিকে বিশ্বমানবের

সেবায় উৎসর্গ করিতে না পারে, তাহার সার্থকতা কোথায়? তাহার জীবনের উৎস আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়।

মনীষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছেন—

"যে কখনও পরের প্রাণে প্রাণ দিয়া সুখের নির্ম্মল আনন্দরাশিতে অবগাহন করে নাই, আপনার একটী প্রাণ সহস্র প্রাণে ঢালিয়া দিয়া মনুষ্য-প্রকৃতির তরল তরঙ্গময় মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করে নাই, সে যোগী হউক, সন্ন্যাসী হউক, ব্রহ্মচর্য্যের পরপারে অবস্থিত থাকুক, তাহার জীবন একাংশে বৃথা, তাহার মনুষ্য-জীবন একাংশে নিষ্ফল।"

স্বার্থপরতাই আত্মবিনাশের নামান্তর, এই স্বার্থপরতাই সমস্ত পাপপ্রবৃত্তির মূলে। ইহা একান্তই সত্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে ছাড়াইয়া যাইতে না পারে, বিশাল মানবসমাজের মধ্যে যে নিজেকে বিলাইয়া দিতে না পারে, তাহার জীবন-ধারণের মূল উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যায়। যে শুধু আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লালায়িত, আপনারই ভোগের নিমিত্ত যাহার সমগ্র আয়োজন, তাহার জীবনের সার্থকতা কি?

'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥'

(গীতা-৩য়-১৩)

কুকুরের মত সে শুষ্ক অস্থিখণ্ড লইয়া প্রাণপণে চিবাইতে থাকে, আর সেজন্য ক্ষত-বিক্ষত মুখাভ্যন্তর হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, তাহাই অস্থি-নিঃসৃত রস মনে করিয়া পরম প্রীত

লাভ করে। সে মোহের ভুলে জানে না যে, নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছে।

লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে প্রকৃতির রাজ্যে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা অপ্রয়োজনীয়, যাহার কোন একটা উদ্দেশ্য নাই, যাহার বিকাশের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা নাই। মানবতার চরণতলে সকলেরই আপন আপন জীবনের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি নিবেদন করা প্রত্যেকেরই জীবনের একটা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যবোধকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মবিলোপ করিয়া সেবা, ক্ষমা, দয়াদাক্ষিণ্য দ্বারা সে যদি তাহার ঐ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে তবে সে নিজের শক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ইহারই নাম Self-realisation। তখন সে হইবে উদার-হৃদয়, দয়ালু, স্নেহবান্, দরদী, মরমী, আনন্দময় সাধক। তাহার জীবন হইবে সুন্দর। ধন্য হইবে, তাহার মনুষ্যজন্ম।

নিজেকে পরহিত-ব্রতে বিলাইয়া দেওয়াতে যে আনন্দ আছে, তাহা সে-ই জানে, যে একদিনের জন্যও সত্যসত্যই নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছে। আত্মোৎসর্গে যে আনন্দ সে আনন্দ ইন্দ্রত্বলাভেও নাই। অহংবোধ একটা ভীষণ ভার, এই ভার হইতে যে মুক্ত সে অসীম নীলাকাশবিহারী বিহঙ্গের মত মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে। মহাভারতে কথিত আছে যে, রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ কাজ পাইয়াছিলেন অভ্যাগত-দিগের পাদ-প্রক্ষালন। অপরাপর আত্মীয়বন্ধুরা সেই বিরাট যজ্ঞের

অন্যান্য গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার লইয়াছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ লইলেন অভ্যাগতদের চরণসেবার ভার। এই কাজে তাঁহার কি আনন্দ, কি গৌরব! এই উপায়েই মানুষ অতিমানুষ বা অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। মানুষ অতিমানুষ হয় সকলের সেবা গ্রহণ করিয়া নয়—সকলকে সেবা করিয়া। যে সেবা গ্রহণ করে, তাহার দেহের মত আত্মাও রুগ্ন। লোকশিক্ষার জন্য যুগে যুগে ভগবান্ এই পুণ্য ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে' শিখাইয়া গিয়াছেন—"যিনি সেবক হইবেন, তিনিই মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সম্ভবম্॥

(গীতা—১০ম-৪১)

শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী তাঁহার কর্ম্মের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে আমরা অবতার বলি, তাঁহাদের সকলেরই ঐ এক ব্রত। তাঁহাদের জীবনের ব্রত ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্র দান, মৃতকল্পকে সঞ্জীবিত করা, নিরুদ্যমকে উৎসাহ দান, দুর্ব্বলকে অত্যাচারিতকে, অসহায়কে রক্ষা করা, আর অহঙ্কারী, ক্ষমতাগর্ব্বে গর্ব্বিত, স্বার্থপর ও দুষ্কৃতদের সমুচিত দণ্ড। তাঁহারা এই সমস্ত কাজের দ্বারা মানুষকে ন্যায়-সত্য-সেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা জীবনকে সম্যক্ ভাবে গঠন করিতে, অর্থাৎ তাঁহাদেরই মত আদর্শ জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সেই সেবাধর্ম্ম কি ? সেবক কে ? যে সেবা করে সেই সেবক। কিন্তু সেবা কাহার ? নিজের ? না। পরকে আপন জ্ঞানে পরেরই সেবা। পৃথিবীর যে যে ক্ষেত্রে দয়া, করুণা, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট, তৎসমস্তই সেবকের জীবনেই পরিলক্ষিত।

জীবনে যদি এই গূঢ় নীতিটীর সহিত আমরা পরিচিত হই, যদি সেবা-ধর্ম্মের বোধিদ্রুমতলে সমবেত হইয়া আমরা এই নীতিকে জীবনে প্রয়োগ করি, শ্রদ্ধাভরে আনত শিরে তাহা মানিয়া লইয়া আমাদের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাই, তবেই আমরা সেই পরমানন্দের সন্ধান পাইব।

বর্ত্তমান জগতে স্বার্থের সংঘাতই বড় হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে, নিজে ভোগ করিবার তীব্র উন্মাদনায় স্বার্থসংরক্ষণের অপচেষ্টায় অধিকাংশ মানুষ বিভোর। এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, কত মারাত্মক, সত্যের পথে অগ্রগতির পক্ষে কত পরিপন্থী, তাহা মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ,
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

এই জ্ঞানে যদি জীবন যাপন করা যায়, পরার্থে জীবনকে বিলাইয়া দেওয়ার, ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদানে পরহিতে পরসেবায় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করার মহানীতির উপর যদি জীবন প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবেই জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে।

যশের মোহে, প্রভাবপ্রতিপত্তি, পূর্ণগর্ভ আধিপত্যের মোহে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহার গৌরব কোথায়? সে ত নামের কাঙাল, তাহার অন্তরে অভাবের কী তীব্র হাহাকার! ইতিহাসে তাহার অস্তিত্বের কোন চিহ্নই থাকে না। সেই-ত প্রকৃত বীর যে নিজকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, বিচার করে না, হিসাব করে না। সে-ই বীর যে অপরকে ভালবাসিতে পারে, অপরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারে—নামের জন্য নহে, যশের জন্য নহে, অপরের দুঃখে বিগলিত হইয়া, সেবা করিয়া আনন্দ আছে বলিয়া।

সেই রকম বীর ছিলেন যীশুখ্রীষ্ট। যখন তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—বিভো, ইহাদের ক্ষমা করো, ইহারা জানে না যে ইহারা অন্যায় করিতেছে।

সেই রকম বীর ছিলেন স্যার ফিলিপ্ সিড্নি, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-পক্ষের আঘাতে আহত হইয়া মুমুর্ষু অবস্থায় স্বীয় হস্তস্থিত জলপাত্র পার্শ্ববর্ত্তী তৃষ্ণাতুর সহযোদ্ধাকে নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী।" এমনই ভালবাসা, এমনই পরার্থপরতা, এমনই স্বর্গীয় সম্পদে তাঁহাদের জীবন সমৃদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহাদের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, তাঁহাদের সমাধির উপর যে শুধু স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু বিশ্বমানবের মনোমন্দিরে তাঁহাদের আসন শাশ্বত।

শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া বিজ্ঞান মনের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে যে সব তথ্যে উপনীত হইয়াছে তাহা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—উচ্চাঙ্গের এবং নিম্নাঙ্গের। হীনবাচক ঘৃণাত্মক বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে—ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্য্যা, হিংসা, দ্বেষ। এইগুলি যখন জাগরিত হয়, তখন তাহার ফল বড়ই বিষময় হইয়া উঠে এবং শরীর-মনের সুস্থতার বা জীবনীশক্তির অনুপন্থী উপাদান উপকরণগুলিকে অনায়াসেই পরিপন্থী করিয়া তোলে। এই হীন বৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিলে তাহারা একদিন কোন-না-কোন ব্যাধির আকার ধারণ করে এবং তাহা ক্রমশঃই দুরারোগ্য হইয়া উঠে।

বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্বতঃই ধরা পড়ে যে বাজারের ভেজাল-দেওয়া খাবার খাইয়া মানুষ যত কষ্ট পায়, মনের অসুস্থতা হইতে মানুষ তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে অশান্তি পায়; অর্থাৎ অধিকাংশ রোগের মূল কারণ হইতেছে ক্রোধ, ঘৃণা, ভয়, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি বিকৃত মস্তিষ্কের বৃত্তি-নিচয়।

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—মানুষ যাহা মুখের অন্তর্গত করে তাহা মানুষকে অপবিত্র করে না, পরন্তু যাহা মানুষের মুখ হইতে বহির্গত হয় তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে।" তাঁহার এই কথার মূলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। যতই মানুষের ভিতরে ঐ সমস্ত হীন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়, ততই সে নামিয়া আসে নিম্নস্তরে, মনুষ্যত্ববোধ ও মনুষ্যত্বের গুরুদায়িত্ববোধ

তাহার ততই লুপ্ত হয় এবং অবশেষে পশুর সহিত তাহার কোন প্রভেদ থাকে না।

পক্ষান্তরে স্নেহ, প্রেম, দয়া, সেবা ইত্যাদি মানব-হৃদয়ের উচ্চাঙ্গের সুকোমল বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশালন হইলে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়। চিত্ত তখন আত্মপ্রসাদ লাভ করে, মন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিতৃপ্ত হয়, চন্দ্রমা হইতে চন্দ্রিকা স্ফুরণের ন্যায় তাহার মুখে শান্তির অমল হাস্য বিগলিত হয়, শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ থাকে এবং আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

শুধু নিজের জীবনে কেন, একের ব্যক্তিগত দোষগুণ অপরের উপরও সমধিক প্রভাব বিস্তার করে। ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা ইত্যাদি আত্মঘাতিকা বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া শুধু যে মানুষ নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করে তাহা নহে, অন্যের জীবনেও তাহার কুফল সংক্রামিত করে, অন্যকেও তাহা কুপথের দিকে টানিয়া আনে, তাহাদের অন্তরে ক্রোধ ও দ্বেষের উদ্রেক করাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে এই বিষের উদ্ভব হইয়া ক্রমে জাতীয় জীবনকেও আক্রমণ করে। ইহা যে কেবল উন্নতির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা নহে, ইহা জীবনের ধ্বংসের পথও পরিষ্কার করে।

পক্ষান্তরে প্রেম, সেবা, দয়া ইত্যাদি সুকোমল ভাবের দ্বারা মানুষ অপরকেও সেই সমস্ত গুণে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হয়। এক দীপ হইতে যেমন শত দীপ জ্বলিয়া উঠে—

একটি প্রেমস্নিগ্ধ আচরণ হইতে তেমনি বহু লোকে প্রেমময় আচরণের দীক্ষালাভ করে।

"As one lamp lights another, not grows less,
So nobleness enkindleth nobleness."

Lowell

ক্ষমা কেবল ক্রূর হিংস্রকে বশীভূত করে না—তাহাকেও ক্ষমা করিতে শিখায়। এই পথই শান্তির পথ, মানুষের বাঁচিবার পথ, এই সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের পথ।

বাস্তবিকই মানুষ ততখানি তেমন ভাবেই পাইবে, যতখানি যেমন ভাবে সে দিতে পারিবে। মানুষের জয়ন্তী উৎসব তাহার নিজের সুকৃতিরই জয়জয়কার, তাহার পরহিতে আত্মোৎসর্গেরই পুরস্কার। আবার মানুষের অখ্যাতি তাহার দুষ্কর্ম্মেরই প্রতিচ্ছায়া, তাহার স্বার্থসাধনের হীন প্রচেষ্টারই দণ্ডস্বরূপ। সদসৎরূপ দুই গিরিশিখরের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় মানবের কর্ম্মক্ষেত্র, সে তথায় যে রকম ধ্বনি তুলিবে তদনুরূপ প্রতিধ্বনিই তাহার কাণে আসিবে।

সংসার, মুকুর স্বচ্ছ হেথা শত প্রতিবিম্ব ঘিরে,
সব মুখভঙ্গিভাব তোমাকেই নিত্য দেয় ফিরে।
চারিপাশে চাহ যদি সুপ্রসন্ন মুখ-পদ্মবন,
প্রসন্ন মুখশ্রী লয়ে স্বচ্ছতায় কর বিচরণ।"

(বল্লরী)

"সমস্ত পৃথিবীর ভালবাসা যদি আমার কাম্য হয়, তবে আমাকেই সর্ব্বাগ্রে সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিতে হইবে।"

নীচ, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণমনা লোককে কেন সকলে ঘৃণা করে, আর মহান্, পরার্থপর, উদারহৃদয় লোককে কেন সকলে শ্রদ্ধা করে? এক কথায় ইহার উত্তর হয় না, ইহার মধ্যে নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান আছে। নতুবা জীবনের পরিপূর্ণতার কোন অর্থই থাকিত না, সে নিগূঢ় কারণটী হইতেছে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি (Magnetic power)। সেই শক্তি এতই প্রাণবন্ত, এতই তেজস্কর যে তাহা আপাত দৃষ্টিতে একটা যাদু শক্তির মত মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি ব্যতাত আর কিছুই নহে। "উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—সমগ্র বসুন্ধরাকে এই রকম নিকটাত্মীয় বলিয়া বরণ কর, মানুষকে বিনা দ্বিধায় অতি আপনার জন করিয়া বুকে টানিয়া লও—ইহাই সেই শক্তির পরিচয়।

এই শক্তি যাঁহার অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত, পরকে আপন করিবার মূল সূত্রটি যাঁহার করায়ত্ত তাঁহার পক্ষে এজগতে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই, ইহাই প্রেমশক্তি, যাহার বলে ঘোরতর শত্রুকেও পরম মিত্র করা যায়, অতি বিরুদ্ধবাদীও পক্ষপাতী হইয়া উঠে। তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী যিনি সেই প্রেমশক্তির বলে পরকে আপন করিতে পারেন, শত্রুকেও বন্ধু করিতে পারেন।

একটী সুন্দর প্রবাদ আছে যে—তোমার শত্রুকে ভালবাসিবে, যাহারা তোমায় ঘৃণা করে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তাহাদিগের

মঙ্গল কামনা করিবে—তবেই তাহাদের হৃদয়রাজ্য জয় করা সম্ভব হইবে, আত্মপ্রসাদ লাভ করা সহজ হইবে। এইরূপে মানুষ মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে। মনুষ্যত্ব আর কাহাকে বলে? তাহা রক্তমাংসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না বা বৃথা বাগ্‌জালের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন থাকে না। এই মানুষের সাধনায় যিনি নিমগ্ন তাঁহার হৃদয় অফুরন্ত প্রেমের উৎস, তাঁহার জীবন কর্ম্মময়। তখন তিনি এমন এক সত্য-লোকে পৌঁছেন, যেখানে আসিয়া তিনি বলিতে পারেন—

"আপনারে লয়ে মগ্ন থাকিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।"

এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমাদের জীবনের রহস্যদ্বার আপনা আপনিই খুলিয়া যায়, বিশ্বের নিগূঢ় তথ্যের সহিত আমাদের চিত্তের আর কোন ব্যবধান থাকে না। বিচিত্র সংসারের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে যে কোন্ এক গোপন উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই যে কোন-না-কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে আপন আপন পথ ধরিয়া প্রতিনিয়ত চলিয়াছে, অনন্তকালের চিরসাথী হইয়া, মানুষও সেই জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করিতে পারে যে, সংসারে তাহারও কর্ত্তব্য আছে।

এই কর্ত্তব্যবোধে মানুষ জানিতে পারে যে পশুত্ব তাহার ধর্ম্ম নহে, তাহার ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব; কোপ, দ্বেষ, হিংসা, ছলনা ইত্যাদি তাহার পক্ষে গৌরবের নহে, তাহার গৌরবের যদি কিছু থাকে তবে তাহা সর্ব্বজীবে অপরিমিত দয়া, করুণা, প্রেম, সেবা। এইরূপ জ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, আজ পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্মের নামে যে আচার অনুষ্ঠানের প্রহসন চলিতেছে তাহা কি প্রকৃত ধর্ম্ম? তাহা ধর্ম্মের খোলস মাত্র, ধর্ম্মের খোলস লইয়া আজ টানাহেঁচড়া হইতেছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম বহুদূরে পড়িয়া আছে।

কবির কথায়

"রথের ঠাকুর নেইক শুধু রথে।"
কোন সাধুর মুণ্ডিত শির কারু বোঝাই জটে,
কেউ বা চলেন তীর্থপথে কেউ বা রহেন মঠে।
তত্ত্বকথায় বাগ্মী কেহ কেউ বা থাকেন মুনি
কেউ বা জপেন তসবি মালা কেউ বা জ্বালেন ধুনী।
কেউবা বাঘা, কেউবা নাগা, কারো হাজার চেলা
সবাই আছে শূন্য কেবল পরম ধনের বেলা।
রথ চলেছে সমারোহে বাজছে শানাই ঢোল,
উড়ছে নিশান, বাজছে বিষাণ, উঠছে কলরোল,
হুলু দিয়ে পুরাঙ্গনা লাজ বরিষে পথে
সবই আছে, রথের ঠাকুর নেইক শুধু রথে।"

(বল্লরী)

যদি কেহ বলে যে অমুক এমন ধার্ম্মিক, কেননা তিনি বাক্‌সংযমী, তিনি সকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করেন, গীতাভাগবত পাঠ করেন, তিনি একাহারী, তিনি তিন ঘণ্টা ধরিয়া একাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে পারেন।—কিন্তু শুধু এই সুপারিশেই আমি কাহাকেও ধার্ম্মিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। ধর্ম্ম ত কেবল একটা শুষ্ক বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র নহে যে, যে ব্যক্তি সে সমস্ত অনুষ্ঠান লইয়া মগ্ন থাকিবেন, তাঁহাকেই ধার্ম্মিক বলা চলিবে। ধর্ম্ম যে প্রাণের জিনিষ। অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে প্রেম স্বতই উৎসারিত হইয়া মরুভূমিতে ফল্গুধারার মতই তৃষাতুরকে পরম অমৃতোপম পানীয় বিন্দু দান করে ধর্ম্ম তাহাই।

প্রেম না দিলে কোন ধর্ম্মই হয় না। ভক্ত কবীর তাই খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

প্রেমের রঙ্গে মন না রাঙায়ে কাপড় রঙাল যোগী,
আহার-বিহার তেয়াগি তাহার সাজিল নেহাৎ রোগী।
জীবে না তুষিয়া শিবে না ভজিয়া পাথর পূজিল গৃহী,
ভক্তি না দিয়া দিল ধূপ-দীপ, দিল ফলমূল ব্রীহি।
প্রেম না বাড়ায়ে সাধু-সন্ন্যাসী বাড়াল জটা ও দাড়ী,
ইন্দ্রিয়কুলে পুড়ায়ে মারিল জয় করিতে না পারি'।
না মুড়ায়ে ফেলি লালসা বিরাগী শুধু মুড়াইল মাথা,
হৃদয় না দিয়া দীনেরে শুধুই টাকা কড়ি দিল দাতা।
কবীর কহিল প্রভুরে, কেউ ত করিল না প্রেমদান,
ভজিল না কেউ, করিল ভজন পূজনের শুধু ভান।

(শ্রীকালিদাস রায় কৃত অনুবাদ)

সামারিটানদের সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের একটী কাহিনী এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। একজন লোক পথে আহত হইয়া পড়িয়াছিল, উচ্চবংশীয় একজন পুরোহিত পথ দিয়া গেল। সে পথ দিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিল না। তারপর একজন মন্দিরের সেবক গেল, সেও থামিল না। তারপর একজন দীনহীন অস্পৃশ্য সামারিটান আসিয়া সেই আহত লোকটীর ক্ষতে তেল ঢালিয়া দিল, তাহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিল। তাহারই হইল যথার্থ করুণা, এবং এই করুণাই যথার্থ ধর্ম্ম। অথচ সেই সামারিটান তৎকালীন ইহুদীসমাজে পতিত বলিয়া পরিগণিত হইত।

ধর্ম্মের এরূপ এক সহজ সরল গতি আছে যে, তাহা যখনই কাহারও হৃদয়রাজ্য অধিকার করে তখনই তাহা দয়া প্রেম, সেবানিষ্ঠতা ইত্যাদিতে ভরিয়া উঠে, তখনই তাহা আপন শক্তিতে ভোগবিলাসে পরিবৃত রাজপুত্রকে রাস্তায় টানিয়া আনিয়া চণ্ডালের সহিত গলাগলি করিতে শিখায়, সকলকে সমজ্ঞানে কোল দিতে শিখায়, অন্নহীনকে অন্ন দিতে, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দিতে শিখায়। ধর্ম্মজ্ঞানের প্রারম্ভ প্রেমে, তার পরিসমাপ্তি সেবায়। যতক্ষণ প্রেমভাব হৃদয়ের গহনতল ভেদ করিয়া স্নেহে দয়ায় সেবা মাধুর্য্যে রূপান্তরিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ না করিয়াছে, ততক্ষণ তাহা বদ্ধকূপেরই সমান; স্রোতস্বিনীর সহজবেগে তাহা পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া পুরজনপদে দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া অমৃতধারা পরিবেষণের শক্তি তাহার নাই।

চোখের সম্মুখে এই যে চলমান জগৎ বিদ্যমান, ইহার কত বৈচিত্র্য, কত মোহনরূপ আমাদের নয়নে পড়িতেছে, আবার আমাদের অজ্ঞাতসারেও ইহা কত বিভিন্ন উপায়ে কত নব-নব লীলাচাতুর্য্যে নিত্যই রূপান্তরিত হইতেছে। ইহা কেন হইতেছে ? নিত্য নূতন সাজে ইহার অভিনয় কেন ? কারণ, তাহার ভিতরে আছে শক্তি, আছে প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির ধর্ম্ম এই যে, তাহা নিশ্চল নির্ব্বিকার হইয়া জড়স্থানুবৎ বসিয়া থাকিবার নহে। সেই মানুষের অন্তরেও যখন আত্মচেতনা জাগরিত হয়, তখন তাহা নিশ্চেষ্ট নির্লিপ্ত, নিষ্প্রাণ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। তাহা প্রাণের সহজ আবেগে উৎসারিত হইয়া পড়ে, তাহা একটী ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ হইতে দাহিকাশক্তি লইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত আকারে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত অসত্যকে দগ্ধ করে।

যাহা সত্য তাহার স্বরূপই এই, যাহা প্রাণবন্ত তাহার ইহাই ধর্ম্ম, তাহা কখনও 'বজ্রাদপি কঠোর, আবার কখনও কুসুমাদপি মৃদু,' তাহা কখনও আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘে বজ্রের হুঙ্কারে আপনার স্বরূপ প্রচার করে, আবার কখনও বিদ্যুতের অমলোজ্জ্বল হাস্য, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আশার আলোক-সঞ্চার করে এবং আপনার প্রেমঘন অন্তরের শীতল বারিধারা নিঃশেষে বর্ষণ করিয়া নিদাঘতপ্ত জীবলোককে জীবনীরসে সিক্ত করিয়া দিয়া যায়। ইহাতেই তাহার আনন্দ, এই সেবা করিতে পারাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র।

এমন করিয়াই মানবের জীবন-মুকুরে সত্য প্রতিফলিত হয়। তখন নিঃশেষে প্রাণোৎসর্গ করিতে পারাটাই বড় হইয়া উঠে, পাওয়াটা নহে। এই প্রবন্ধের প্রথমে যে বলা হইয়াছে—"আমি বাঁচিতে চাই—তাহা তখনই সম্ভব হইয়া উঠে, যখন পরার্থে জীবনকে মহামানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করা হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মত কত ধনিদুহিতা পৃথিবীর বুকে আসিয়া, হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদের নামও কাহারও জানা নাই। কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের আর্ত্তকণ্ঠের করুণ আশ্বাসে সেই নারী আপনার সমস্ত ভুলিয়া তাহাদের সেবায় আত্মজীবনকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মানুষের মধ্যে আজও অমর হইয়া রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত আরও যে সমস্ত হৃদয়বান্ মানব-সন্ততি পৃথিবীতে আসিয়া পরহিতে পরসেবায় আপন-আপন জীবনকে অর্ঘ্যরূপে দান করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সেই কাহিনী আমাদের এই শিক্ষা কি দেয় না যে— "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই!"

প্রয়োগ

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—যে জীব মানবদেহেই কর্ম্ম করিতে আসে, আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের অতন্দ্রিত সাধনাবলে মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে, কর্ম্মবলে মহামুক্তির সন্ধান পায়।

ইহাই হইল মানবজীবনের চরম পরিণতি এবং সমস্ত সভ্য-দেশের মহান্ ধর্ম্মসমূহের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

মানুষ যখন আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে জগতে তাহার কত কর্ত্তব্য আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের বুকে তাহার কি বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন! মনুষ্যত্ব-বোধ যতই তাহার প্রবুদ্ধ হয়, মুক্তির সাধনায় যতই তাহার মন বিচার-বিতর্কে মাতিয়া উঠে, ততই তাহার মনে এই প্রতীতি জন্মে—

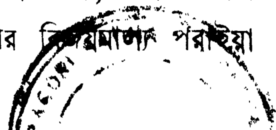
"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন তরে
বাঁধা সবার কাছে!"

এই জ্ঞান উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ দেখিতে পায় তাহার জীবন কর্ম্মময়, কর্ম্মই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। তাহার ভিতর কোমলতা, সরসতা, স্নেহ, দয়া, ভক্তি ইত্যাদি সদ্গুণা-

বলীর কোন মূল্য নাই, কোন সার্থকতা নাই, যদি না তাহার প্রত্যেক বাক্যে চিন্তায় আচরণে সেইগুলি রূপান্তরিত হয় বা ব্যবহারিক জীবনে সেগুলি প্রযোজিত হয়। সেইজন্য মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে চাই তাহার সংচিন্তার, সমস্ত ভাবধারার ব্যবহারে বিনিয়োগ, চর্য্যা বা আচরণে অভিব্যক্তি।

কোন একটী বিশিষ্ট ব্যাপারে নাম যশ লাভ করিয়া সুখ-শান্তি লাভ করাই কি তোমার বাসনা? দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহাই কি তোমার আকাঙ্ক্ষা যে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হইবে? বক্তৃতার আকর্ষণে হাজার হাজার লোকের চমক লাগাইয়া দিয়া তাহাদের সুখ্যাতিভাজন হইবে?

তাহা হইলে মনে রাখিও যে কোন একটা মহৎ উদ্দেশ্য বা আদর্শ ব্যতীত কেহ কোন দিন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হইতে পারে নাই এবং কোনদিন পারিবেও না। দেশের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে অথবা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি জ্ঞানলাভ করিতে পার, প্রসিদ্ধ বক্তৃতা-বিদ্যায়তনে অথবা কোন বাগ্মিবরের নিকট তুমি বক্তৃতার কৌশল শিক্ষা করিতে পার, বক্তৃতাশিক্ষার যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলির বিশিষ্ট দান আয়ত্ত করিয়া আপনার দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইতে পার, এমন কি এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে তুমি আজন্ম কাটাইয়া দিতে পার, কিন্তু যদি তোমার এই কঠোর সাধনার মূলে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত না থাকে, তবে তোমার এই প্রয়াস তোমার কণ্ঠে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীর বিজয়মাল্য পরাইয়া দিবে না।



জগতের ইতিহাসের বিখ্যাত বাগ্মীদের কথা একবার ভাব দেখি! বাগ্মিবর ডিমোস্থিনিস হইতে আমাদের দেশের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় নিবেদিত-জীবন মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত পর্য্যন্ত যে সমস্ত মহাপুরুষ আমাদের মনে শাশ্বত আসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, যে সম্পদ্‌বলে তাঁহারা আজ দেশবরেণ্য হইয়াছেন তাহা বাগ্মিজন-লভ্য যশ বা খ্যাতির লোভ নয়—তাহা একাগ্র একনিষ্ঠ সেবাধর্ম্ম – দেশসেবার বাসনা।

স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে যাহারা যাইতে পারে না, যাহাদের সমস্ত ছোট বড় কাজের মূলে থাকে কেবল স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য তাহাদের জীবন অতি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহারা মনুষ্যত্বের অতি নিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যাঁহার জীবন সেবাধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত তিনি দেশকালপাত্রের গণ্ডীর বাহিরে আপনার স্থান খুঁজিয়া পা'ন এবং ইহাই তাঁহার সাধনায় অলৌকিক শক্তি প্রদান করে। এই শ্রেণীর মহাপ্রাণ ব্যক্তি আপনাকে বিশ্বহিতৈষণারূপ মহতী সাধনায় প্রতিনিয়ত নিমগ্ন থাকেন এবং প্রকৃতি যেন তাহার সদুদ্দেশ্যের সহায়ক হইয়া তাহাকে এমন শক্তি প্রদান করে যে শক্তিবলে তিনি তাহার শ্রোতৃবর্গের মনে অদম্য কর্ম্মপ্রেরণা এবং আত্মচেতনাবোধ জাগরিত করিয়া দেন। বস্তুতঃ তিনিই

বাক্যবীর যিনি বিশ্বের চিরন্তন সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি লাভ করিয়া অন্যের কাছে তাহা আপনার আবেগময়ী ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন।

শাসনকার্য্যে দক্ষতালাভ করাই অর্থাৎ শাসনকুশলী বা রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ হওয়াই কি তোমার ইচ্ছা? রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ কথাটা শুধু শব্দমাত্র নহে। যিনি রাষ্ট্রের সেবায় তথা দেশবাসীর কল্যাণার্থে আত্মনিয়োগ করেন,—দেশের, দশের মনোভাবের সহিত যাঁহার অবিচ্ছেদ্য নাড়ীযোগ আছে, যিনি দেশের কোন্ অঙ্গে শক্তি আছে জানিতে পারিয়া তাহা কাজে বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করেন, আর কোন অঙ্গে শক্তির অভাব তাহাও জানিতে পারিয়া সেই অঙ্গে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবলে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্, তিনিই স্বদেশ-ভক্ত, তিনিই কর্ম্মকুশল, দেশহিতৈষী।

পৃথিবীর এই সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত এবং অধিকাংশই লোকান্তরিত হইয়াছেন, মানুষের মনে এখনও বাঁচিয়া আছেন। তাঁহাদের দেশতন্ময় জীবন এই মহতী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, দেশহিতৈষণা অপরের কল্যাণ মনে করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাই ছিল তাঁহাদের পরম সাধনা।

ভারতীয় মহাত্মাদের মধ্যে দুইজন লোক—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মহোদয়ের এই প্রসঙ্গে নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনের অবসান

হইয়াছে তবুও তাঁহাদের কীর্ত্তিময়ী পুণ্যস্মৃতি চিরদিন ভারতবাসীর মনোলোকে জাগরূক থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেইরূপ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসসেবার মধ্যে কংগ্রেসের জন্ম হইতে এই পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিলে যথার্থ স্বার্থত্যাগী পরহিতব্রতী মহাপ্রাণ অতি অল্পই মিলিবে, যাঁহারা মানবের মঙ্গলার্থ প্রণোদিত হইয়া জাতীয় পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন এবং প্রকৃত দেশহিতৈষীর মতই কাজ করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

আজ কালকার মিউনিসিপালিটীর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, এখানে যাহাদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হইলে নগরবাসিগণের প্রকৃত হিত হইতে পারিত, তাহাদের হাতে না দিয়া এমন কতকগুলি লোকের হাতে সেই ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, যাহাদের অধিকাংশই শুধু স্বার্থসিদ্ধির পূজারী, শুধু 'যেন তেন প্রকারেণ' আপনাদের সুবিধা-সুযোগ-বৃদ্ধির জন্য লালায়িত।

আজ বড়ই দুঃখের সহিত এ কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যাহাদের হাতের শাসনের এতবড় একটা দায়িত্ব রহিয়াছে, যাহাদিগকে সমাজ বিশ্বাস করিয়া শাসনের মস্‌নদে বসাইয়াছে, তাহারাই উচ্চপদ পাইয়া আজ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন, নিজেদের দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহাদের পদপ্রাপ্তির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন।

আমার এইরূপ বলিবার কারণ কি তাহা মিউনিসিপালিটীর কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এই

সমস্ত ব্যাপার আজ যে রকম ঘৃণিত এবং শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের চোখে তাহা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত ব্যাপারের মূলে কিসের অভাব ? কিসের অভাব আমাদিগকে এতটা ক্ষুব্ধ করিতেছে ? অভাব আর কিছুরই নহে, ঐকমাত্র হৃদয়বান্ উদারস্বভাব লোকের অভাব। বস্তুতঃ আজ দায়িত্বপূর্ণ কাজে যত সব স্বার্থলুব্ধ লোকের আগমনের ফলে এমন এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে যতক্ষণ ইহার প্রতিকার না হইতেছে ততক্ষণ এ জাতির আর কল্যাণ নাই। এই অপচার কেবল যে কলিকাতা নগরীতে বিদ্যমান তাহা নহে, অন্যান্য প্রদেশের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিও এই হীনতার ও সঙ্কীর্ণতার আক্রমণ হইতে মুক্ত নহে। বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নানাপ্রকার অনাচার চলিতেছে।

যাহা হউক এই রকম শঠতা আর বেশীদিন লোকের চোখে ধূলা দিতে পারিবে না, করদাতারা ইহা নিশ্চয় অচিরেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং তাহারা যদি সকলে আপনাদের তথা দেশের সম্মান এবং কল্যাণ কামনা করেন, তাহা সকলে সম্মিলিতভাবে এই কুপ্রথার উচ্ছেদ করিবার যথারীতি উপায় অবলম্বন করিবেন। তাহাদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়ত স্বার্থপরদের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে, নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয়ত তাহারা সর্ব্বপ্রকারে কূট-কৌশল অবলম্বন করিবে, কিন্তু যাহা সত্য, যাহা

ন্যায্য, যাহা সঙ্গত, যাহা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী—ইতিহাসে কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে এমন সমস্ত লোকের প্রয়োজন, যাঁহাদের প্রাণে সত্য সত্যই দেশপ্রীতি জাগরূক, যাহাদের জীবন সেবাধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারিব, রাষ্ট্রবিদ্ কথাটার কদর্থ করিয়া কখনও ইহার অবমাননা বা অপপ্রয়োগ করিব না।

যাহাদের প্রাণে দেশপ্রীতির লেশমাত্র নাই, দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার সহিত যাহাদের পরিচয়ের একান্ত অভাব, সেই সকল হীন স্বার্থপরের দলকে কখনও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ বলা চলে না। যদি জন-সেবায় যোগদান করিবার সদিচ্ছা থাকে তাহা হইলে প্রথমে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা থাকা উচিত—প্রকৃত রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞের অন্তরাবেগ লইয়াই সেখানে যোগদান করা উচিত।

ইহাই কি তোমার অভিলাষ যে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গুরু হইবে? তাহা হইলে একথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা উচিত যে পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মগুরুই মানুষের প্রতি গভীর প্রেমে, দরিদ্রনারায়ণের সেবায়, ক্ষমা ও তিতিক্ষায়, আপনার হৃদয়বত্তার গভীর এবং সহজ স্ফূর্ত্তি প্রেরণায় আত্মানিয়োগ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছিলেন। অহংজ্ঞান তাঁহাদের ছিল না। মান, যশ, খ্যাতির কাঙ্গাল তাঁহারা ছিলেন না।

তাঁহারা কোন দিন ভ্রমেও মানুষকে মনের সঙ্কীর্ণতা,

ধর্ম্মের গোড়ামি বা প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানকে জীবনে বড় করিয়া দেখিবার উপদেশ দেন নাই! শুধু আচার অনুষ্ঠানকে জীবনে বড় করিয়া দেখিবার উপদেশ তাঁহারা কখনও দেন নাই। শুধু আচার অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ বা ধর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ লইয়া তর্ক-বিতর্কে কাল হরণ কোনদিন তাঁহাদের আচরণে লক্ষিত হয় নাই।

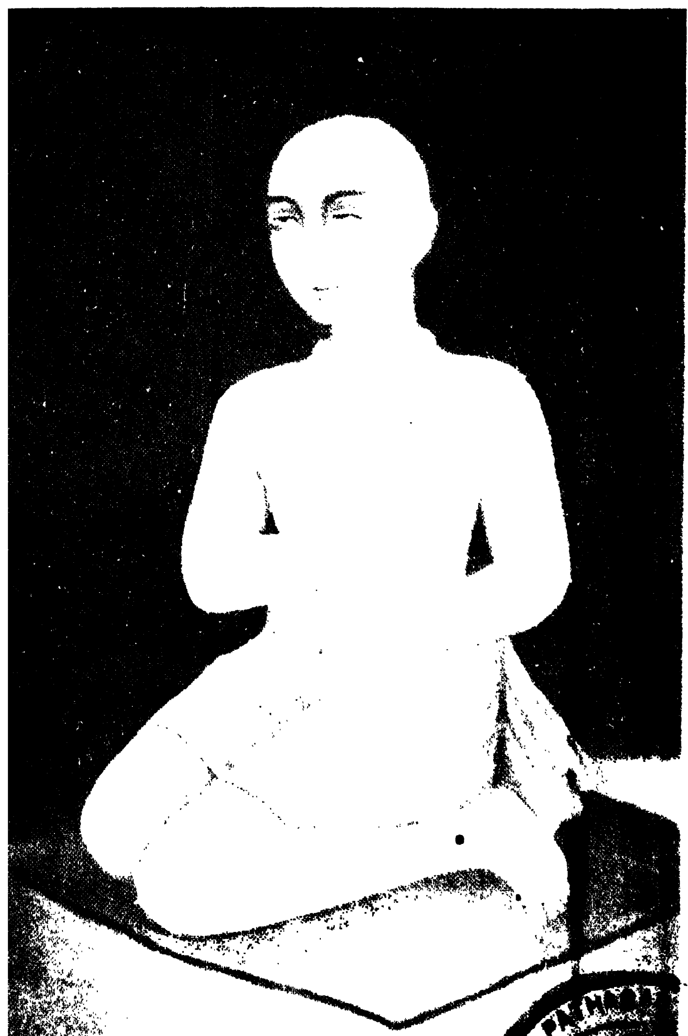
সহস্র সহস্র মানুষ অনাহারে দৈন্যে দুর্বিপাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অথচ এই তথাকথিত সভ্যসমাজের আজ এই ক্ষুধিত জনগণের জন্য সত্যকার দরদ কোথায়? একদিকে মানুষ ভোগবিলাসের তুঙ্গশৃঙ্গে বসিয়া সমগ্র পৃথিবীকে আপনার করায়ত্ত করিবার সুখস্বপ্নে বিভোর,—অন্যদিকে তাহারই ভাই মনুষ্যনামধেয় শত সহস্র জীব কায়-ক্লেশে আপনাদের ক্ষুন্নি-বৃত্তির জন্য দুই মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে সমস্ত দিন হাহাকার করিতেছে! কোথায় তাহার মনুষ্যত্বের সাধনা, কোথায় তাহার শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সুযোগ? সমাজের কি নির্ম্মম বিধিব্যবস্থা! মানুষের প্রতি মানুষের এই উদাসীনতা, এই হৃদয়হীনতা অথচ বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধানুরাগ মানুষের জীবনে বড় হইয়া উঠিল কেন?

তাহার কারণ মানুষ ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের খোলসকে পূজা করিতেছে, জীবনী শক্তির পরিপোষক অমৃতোপম সত্যকে ছাড়িয়া মিথ্যার বোঝাকেই শিরোধার্য্য করিয়াছে। শক্তির সাধনায় মানুষ যে ভ্রান্তপথে চালিত

হইয়াছে মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়হীনতাই তাহার অবশ্য-স্ভাবী ফল। শক্তি-সাধনায় মানুষের রচিত বিধিনিয়ম বা কোন একটা নির্দ্দেশিত বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া যদি আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু-কিছু সময় অতি নির্জ্জনে অতি নীরবে অনন্তের সহিত সংযোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হই, যদি আমাদের চঞ্চল মনকে পৃথিবীর সমস্ত বাহ্য বস্তু হইতে অপসারিত করিয়া অনন্তের ধ্যানে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি, তবে আমরা আত্মজ্ঞানের পথে কত শক্তি যে সঞ্চয় করিতে পারি তাহার ইয়ত্তা নাই। মনুষ্যত্ব লাভের পথে শক্তি লাভের ইহাই একমাত্র উপায়।

পৃথিবীতে নানা মত, নানা পথ আছে। বিবেক বা বিচার বুদ্ধির বিনিময়ে মানুষ যে কোন ভ্রান্তধারণার অনুগামী হইয়া জীবনপাত্রকে কলুষিত জলে পূর্ণ করিয়া তোলে, আবার আত্মগৌরব বা অহঙ্কারের খরতাপে তাহাও শুকাইয়া যায়! থাকে শুধু 'পঙ্ক, কর্দ্দম ও ক্লেদ'। এইরূপ কলুষিত জলের সংস্পর্শে না গিয়া যদি কেহ জীবননদীর অফুরন্ত উৎসে পৌঁছাইতে পারেন, তবে তিনিও সেই চির-সুধারস আকণ্ঠ ভোগ করিয়া অক্ষয় শান্তি লাভ করিতে পারেন। সেই অমৃতের সন্ধানে মানুষকে নিজে যাইতে হয়, অপরের সাহায্যে তাহা আনয়ন কারিবার প্রয়াস এইক্ষেত্রে চলে না।

সেইজন্য দৈনন্দিন জীবনের কিছু সময়, অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা কি ঘণ্টার এক চতুর্থাংশ সময়, নীরবে সেই অনন্তশক্তির



অনন্ত উৎস সন্নিধানে কাটাইতে হয় এবং তোমার যত কিছু বলিবার, চাহিবার আছে সব সেইখানে বিনয়নম্রভাবে নিবেদন করিয়া যদি পরম নির্ভরের সহিত প্রতীক্ষা করিতে পার, তবে একদিন-না-একদিন তোমার ঈপ্সিত ধন মিলিবেই।

সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত সত্য, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনীষা আর কিছুই তোমার অনধিগম্য থাকিবে না, যদি তুমি একান্ত ভাবেই এইগুলিকে পাইবার উদ্দেশ্যে যথাযথ পথে চলিতে পার! ইহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে যে, যেখানে উদ্দেশ্য মহৎ সেখানে সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীর প্রকৃত শিক্ষকেরা এই উপায়েই শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে একবার স্মরণ কর দেখি। কি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়া তাঁহারা জগৎকে সত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে জনৈক ভদ্রলোকের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়। ভদ্রলোকটী বেকার অবস্থায় একটী ধর্ম্মপ্রচারক সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কথার প্রসঙ্গে ভদ্রলোকটী তাঁহার অন্তর্নিহিত সুন্দর শক্তির অনুভূতির কথা বলিতে লাগিলেন এবং আরও বলিলেন যে সঙ্ঘের অন্যান্য সকলেই তাঁহার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সকলেই সেই শক্তির রহস্য নির্ণয়ে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিষয়টা এই যে, সেই ভদ্রলোকটী প্রত্যহ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে

একটী ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া একান্ত নিভৃতে সেখানে কাটাইতেন। এইভাবে তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত আত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং সেই আত্মার অসাধারণ শক্তির সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন এবং এই দুইটীকে তিনি এক সময়ে একত্রীভূত করিতে পারিয়াছিলেন।

এই উপায়েই আত্মশক্তি জাগে এবং এই শক্তির বলে মানুষ পৃথিবী টলাইতে পারে, অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে এবং এই শক্তির বিরুদ্ধে কোন বাধা কোন বিঘ্ন ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-বীরদের কথা স্মরণ করিতে বলি। পৃথিবীর সেই ধর্ম্মগুরুগণ যাঁহারা ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ধর্ম্মের আচার, নিয়ম, বিধিবিধানের সতত বাহিরে থাকিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে সমানভাবে প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে এই দুইটী বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়,—প্রথম,—তাঁহারা নিভৃতে নীরবে আত্মশক্তির সাধন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়,—প্রত্যেকেই তাঁহাদের জীবনকে প্রেম ও সেবাধর্ম্মের মহানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইহাই কি তোমার আকাঙ্ক্ষা যে, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হইবে? খুব ভাল কথা। কিন্তু মনে রাখিও যদি পৃথিবীকে তোমার দান করিবার কিছু থাকে, যদি মানবসমাজ তোমার নিকট হইতে কিছু পাইয়া বাস্তবিকই উপকৃত হয়, যদি তোমার জীবনে এমন কোন শক্তি থাকে যাহার সাহায্যে জগতের কিছু

কল্যাণ সাধন করিতে পার বলিয়া তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তোমার কুণ্ঠিত হইবার কারণ কিছুই নাই। আজ পর্য্যন্ত যশো-মানের লোভে যাঁহারা লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া গণ্য হ'ন নাই। তাহার দ্বারা জগতের কোন কল্যাণই সিদ্ধ হয় নাই।

লেখক যাহা লেখেন, তাহা মোটামুটি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের, তাঁহার স্বভাবের, তাঁহার অভিজ্ঞতার তাঁহার উদ্দেশ্যেরই সমষ্টিগত ছায়া মাত্র। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তিনি যাইতে পারেন না। সুতরাং নাম, সম্মান বা স্বার্থানুসন্ধিৎসার মোহ কাটাইয়া যদি তিনি উঠিতে অক্ষম হ'ন, তবে তাঁহার লেখা স্বাথ-সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট হইবেই এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে যিনি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করেন, মানব-সমাজের উন্নতি-কল্পে, জীবজগতের কল্যাণ-কামনায়, প্রকৃত হিতার্থে তাঁহার কিছু দিবার আছে বলিয়াই দিতে অগ্রসর হন, তিান বিনিময়ে নামযশের কামনা না করিলেও পরোক্ষভাবে ঐগুলির সম্যক্ অধিকারী হন। মানুষের প্রীতিভাজন হইতে হইলে এইভাবে নিঃস্বার্থ হইয়াই কাজ করিতে হয়, নামযশের লোভে লালায়িত হইয়া নহে। মানুষের জন্য যদি তুমি বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় নির্দ্ধারণে কিছু না কর তাহা হইলে মানুষও তোমাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের শ্রদ্ধা দান করিবে না।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ—যাঁহার 'নিভৃত চিন্তা' প্রথম হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মনীষী বলিয়াছেন—"এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার আড়াই বৎসর পূর্ব্বেও আমি লিখিবার কথা কখনও ভাবি নাই। কিন্তু যখন কতকগুলি চিন্তা আসিয়া আমার মন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল এবং প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল, তখন আমার মনকে সেই ভারমুক্ত করিবার জন্য আমি লিখিতে আরম্ভ করি।"

এইরূপ অবস্থা যেখানে বিদ্যমান সেখানে যে লেখকের প্রথম গ্রন্থ এবং তৎপরবর্ত্তী সমস্ত গ্রন্থই বিশেষ আদরণীয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তিনি গভীরভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে তাঁহার এমন কিছু সম্পদ ছিল, যাহা বাস্তবিকই জগতের উপকারে আসিবে ; সুতরাং তিনি তাহা না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার এই দানের মূলে স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না, খ্যাতি বা অর্থলাভের প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। দেশবাসী তাঁহার এই কাজের গৌরব স্বীকার করিয়াছিল।—যদিও তিনি উপরি-উক্ত কোনটারই প্রত্যাশায় এই কাজে হাত দেন নাই; তবুও দেশবাসী তাঁহাকে উভয়ের দ্বারাই পুরস্কৃত করিয়াছিল।

ইহাও একবার অনুধাবন কর—'আমি লিখিতে ভালবাসি বলিয়াই লিখি, অর্থ বা নামের জন্য নহে।' কিছু পাইবার আশায় কাজের অনুষ্ঠান না করিয়া কর্ম্মপ্রীতি লইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে

সহজেই পুরস্কার মিলে। ইহাই পৃথিবীর প্রসিদ্ধ লেখক এবং গ্রন্থকারদের, অন্ততঃ যাঁহাদের মতামতের সহিত আমার পরিচয় ঘটিয়াছে—তাঁহাদের উক্তি।

সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের ভিতর দিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিশ্বহিতৈষণার জন্য যদি তোমার অন্তর উল্লসিত না হয়, মানব-সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত যদি তোমার মন ব্যাকুল না হয়, তবে নাম যশের মোহে তোমার পক্ষে লেখনী ধারণ করা অপেক্ষা কিছু না লিখিতে যাওয়াই বিজ্ঞের কাজ। কারণ, যাহা তুমি লিখিবে তাহা কুত্রাপি আদৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, তোমার শ্রমের পুরস্কার কখনও মিলিবে না।

ইহা খুব সত্য যে, কেবলমাত্র অন্তরের ধনই অন্যের অন্তরে স্থান পায়। যে কোন পুস্তকাগারের প্রসিদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থরাজি বাছিয়া লও, দেশের গ্রন্থকারগণ শুধু অলঙ্কারতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া ঐ সমস্ত মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি পংক্তিতে, প্রতি কথায়, তাঁহাদের হৃদয়ানুরাগের তাহাদের আন্তরিকতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মনে প্রাণে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, একান্ত সত্য বলিয়া যাহা তাঁহাদের অন্তরে উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই একদিন পূর্ণিমার জোয়ার বেগে তাহাদের গোপন হৃদয়কন্দর হইতে বিশ্বের আলোকে উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রীতিপূর্ণ প্রেমপূর্ণ অন্তর তাঁহাদের ছিল, তাই তাঁহারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী।

তুমি কি একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী হইবার অভিলাষী? তাহা হইলে সেখানেও স্মরণ রাখিও যে যদি তুমি শুধু আত্মাদরে স্ফীত হও, যদি জনসমাজের সাধুবাদ লাভই তোমার উদ্দেশ্য হয় অথবা সঙ্গীতকে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়-স্বরূপ অবলম্বন কর, যদি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত পুলকঝঙ্কারে তোমার গান শ্রোতার কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ না করে তবে তোমার সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইবে ইহা সুনিশ্চিত।

আর যদি প্রাণের আবেগে অন্তরের গভীরতম প্রেমের প্রেরণায় যদি কণ্ঠ ছাড়িয়া গান কর, তবেই তুমি কেবল লোকসমাজে বরেণ্য ও নমস্য নয়, চিরকাল ধরিয়া, যখন তোমার কণ্ঠ নীরব হইয়া যাইবে তখনও তুমি সঙ্গীতগুরু বলিয়া পূজিত হইবে। মানযশের জন্য তানসেন সঙ্গীত সাধনা করেন নাই, মানযশই তাঁহাকে বরণ করিয়া বাদসাহের শাহী মজলিসে লইয়া আসিয়াছিল। রামপ্রসাদ প্রাণের আকুল আবেগে কণ্ঠ ছাড়িয়া মা'র নাম কীর্ত্তন করিতেন; তিনি যশের কাঙাল ছিলেন না—তাই আজ বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে তাহার নিত্য পূজা চলিয়াছে।

মা-লক্ষীদের জিজ্ঞাসা করি, সমাজে একজন বিলাসিনী নারী বলিয়া পরিচিত হইতে এবং শুধু নিজের সুখসুবিধা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে কি তোমার অভিলাষ আছে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে মুহূর্ত্তমাত্র একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি যে পথ বাছিয়া লইতেছ সে পথে চলিতে গেলে কোন কালেও

তুমি সুখী হইতে পারিবে কিনা? একথা নিশ্চিতভাবে জানিও যে কেহ কোনদিন সুখের অন্বেষণে ঘুরিয়া জীবনে প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় নাই, পরন্তু অবসাদ, দুঃখদৈন্য অসন্তোষ প্রভৃতিই তাহার অদৃষ্টে জুটিয়াছে, সুখ বা আনন্দ কার্য্য-সম্পাদনের মূলেই রহিয়াছে। ব্যর্থ অনুসন্ধানের ক্লেশে তাহার সকল মাধুরী নষ্ট হইয়া যায়।

তুমি সেই কাজে আপনাকে নিয়োজিত না করিয়া কেবল সুখের প্রত্যাশায় ছুটিবে? সে ক্ষেত্রে প্রকৃত আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

জীবনে ইহা একটি অতি বড় সত্য যে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পাইতে হইলে জীবনকে পরসেবাব্রতে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সুখকে বর্জ্জন করিতে পারিলেই জীবন সুখময় হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ তাহার রাজারাণীর কথোপ-কথনের মধ্যে এই সত্যের ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট ভাষায় করিয়াছেন। রাণী রাজাকে তাহারই প্রেমের জন্য তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এই ত্যাগেই একদিকে পরিপূর্ণ প্রেমলাভ অন্যদিকে প্রকৃত রাজগৌরব লাভ সম্ভব।

যে মায়া সুখের জন্য লোকে এত লালায়িত—রবীন্দ্রনাথ সে সুখের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইয়াছেন—'সুখ' নামক কবিতায়—

কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তারে প্রাণপণে—মুঠির ভিতরে
টুটি যায়। হেরি তারে তীব্রগতি ধাই,
অন্ধবেগে বহুদূর ফেলি চলি যাই
আর তার না পাই উদ্দেশ।

J. Heywoodএর দুইটি পংক্তি এখানে স্মরণ করিতে বলি—

Follow pleasure and then will pleasure fly,
Flee pleasure and pleasure will follow thee.

যদি এই কথা তোমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তবে এই মুহূর্ত্তেই তোমার পূর্ব্ব পরিকল্পনা, পূর্ব্বধারণা পরিবর্ত্তন করিয়া জীবনসৌধকে আত্মত্যাগময় সেবাধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

মনে রাখিতে হইবে—তাজমহল যে অপূর্ব্ব, এত মনোহর —এতকাল ধরিয়া যে তাহা দর্শকের চিত্তহরণ করিতেছে—তাহা কেবল তাহার গঠন-সৌষ্ঠবের জন্য নহে—তাহা যমুনা-তীরে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত আছে বলিয়া। জীবনের সম্বন্ধেও তাহাই!

প্রেমবিস্তার করিয়াই অপরের চিত্ত জয় করা সম্ভব, নিজে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াই অপরের ভিতর সেবা-প্রবৃত্তির উদ্রেক করাইতে হয়, চোখ রাঙাইয়া বা ধমক দিয়া আপনার ভৃত্যের নিকট হইতেও আন্তরিক সেবা আদায় করা যায় না, এবং সেই

কারণে ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত করা মূর্খতারই পরিচায়ক! আপনার আজ্ঞাধীনে যাহারা আছে তাহাদেরও মানুষের প্রাণ, মানুষের অন্তর, মানুষের বোধশক্তি আছে। তোমার নিকট হইতে তাহারা কর্কশ ব্যবহার চাহে না। শুধু তোমার প্রেমপ্রসন্ন আপ্যায়নটুকু পাইলেই তাহারা তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইবে।

প্রভূত বিত্ত সঞ্চয়ের দ্বারা ধনশালী নামে পরিচিত হওয়া এবং সুখসৌভাগ্য উপভোগ করাই কি তোমার অভিলাষ? মনে রাখিও জীবনে সেই সম্পদের অধিকারী হইতে হইলেও চাই তোমার বিত্তের সদ্ব্যবহার, মানবসেবায় সেই সঞ্চিত অর্থের নিয়োগ। যদি তোমার ধনসম্পদের প্রকৃত ব্যবহার না হয়, যদি মানবের কল্যাণে তাহা নিয়োজিত না করিয়া শুধু স্বর্ণরজতের জীবনহীন স্তূপে পরিণত হয় তাহা হইলে সেই সঞ্চিত অর্থে তোমার আত্মার কোন উপকার হইবে না, বরং উদ্বেগ অশান্তি ও অস্বস্তিতে তোমার জীবন ভরিয়া উঠিবে।

মনে রাখিও জড়পদার্থের নিজস্ব কোন মূল্য বা মহিমা নাই। তোমার ব্যবহারনীতির উপর, তোমার প্রয়োগভঙ্গীর উপরই বস্তুর মূল্য বা মহিমা নির্ভর করে। তুমিই মর্ম্মরস দিয়া তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পার, তোমার মনুষ্যত্বের মাধুরী তাহাতে যোগ দিয়া তাহার মহিমা ও মূল্যবত্তার সৃষ্টি করিতে পার। প্রেমই তাহার মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে পারে। জীবসেবাই তাহাকে মূল্যমহিমা দান করিতে পারে।

রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রার অধিকারী হইয়া নিজের সাংসারিক অভাব অতিযোগ বিদূরিত করিতে পারিলেই ধনরাশির সদ্ব্যয় হইবে একথা বলা চলে না। জগৎ সংসারের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে পারিলেই তোমার ধনরাশির সদ্ব্যবহার হইবে। অন্যথায় তোমার আত্মা অর্থগৃধ্নুতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে কখনও বিমুক্ত হইতে পারিবে না,—তোমার মন সঙ্কুচিত হইয়া তোমার শত শত বৎসরব্যাপী তপস্যা-প্রসূত মনুষ্যজন্মকে বিফল করিয়া দিবে ও তোমার স্তূপীকৃত অর্থরাশির উপরেই তোমার জীবন্ত সমাধি হইবে।

তোমার ব্যবহার-নীতির উপরে তোমার সঞ্চিত অর্থের সার্থকতা তথা—তোমার মানসিক সুখশান্তি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অর্থের অপপ্রয়োগ করিয়া মনকে কলুষিত হইতে দিও না, তোমার হৃদয়ের সমস্ত কোমলবৃত্তি ও সদ্‌গুণাবলীর অপমৃত্যুর কারণ হইয়া নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রসারিত করিয়া দিও না।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হও, সত্য-শিবসুন্দরের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তোমার জীবন মঙ্গলময় হইয়া উঠিবে। তোমারই বিবেকবুদ্ধিপ্রসূত প্রয়োগশক্তি তোমার অর্থকে পরমার্থ লাভের উপায় করিয়া তুলিবে।

ধনী বলিয়া মান্য হইতে হইলে ধনের শৈল নির্ম্মাণ করিলেই

চলিবে না। ধনের কথা মনে আসিলে জগৎ শেঠকে মনে পড়ে না, মনে পড়ে রাণী ভবানীকে। যাহার ধন বর্গীরা লুটিয়া লইয়াছিল তাহার কথা ইতিহাসের ফিরিস্তিতে আছে, আর যাহার ধন সমগ্র দেশবাসীর সেবায় মাতৃমমতায় জীবনময় হইয়া ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার কথা আজও এদেশের লোকের জপ-মালা হইয়া আছে। যদি ধনী বলিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া গণ্য হইতে চাও—তবে তোমার আদর্শ হউক রাণী ভবানী, অহল্যা-বাই,—জগৎশেঠ নয়।



—বিকাশ—

মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি প্রেম ও সেবাধর্ম্ম ; ক্রমপরিণতিশীল অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে ইহা সহজ সরল গতিতে চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই বৃত্তি মানবজীবনের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হইলেও, এমন মানুষের অভাব নাই—যাহাদের চিত্তে এই বৃত্তির অঙ্কুরোদ্গমও হয় না। এই শ্রেণীর মানুষের নীরস জীবনকে সরস করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাদের মরুময় জীবনে প্রেম ও সেবার পূত মন্দাকিনী প্রবাহ আনিতে হইলে তাহাদের সম্মুখে প্রেম ও সেবাধর্ম্মের সদ্দৃষ্টান্ত মুহুর্মুহুঃ উপস্থাপিত করা উচিত। ইহাতে একদিকে যেমন পশুপ্রকৃতি মানুষের মনে ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের সঞ্চার হইবে, অন্যদিকে তেমনি প্রেমিক সেবাব্রতীও অপার আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

কবি ঠিকই বলিয়াছেন

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলি দাও
তার মত সুখ আছে কি কোথাও, আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

পরের মঙ্গলসাধনের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলে সুযোগের অভাব ঘটে না। ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেরই জীবনে প্রতিদিন প্রতিপদে এমন অসংখ্য সুযোগ আসিয়া থাকে। চাই প্রাণপণ আগ্রহ, চাই একনিষ্ঠ চেষ্টা। নিঃস্বার্থ পরোপকারের

বিনিময়ে মানুষ যে কি তৃপ্তি কি আত্মপ্রসাদই না লাভ করে! অবশ্য এই মহতী প্রচেষ্টার প্রারম্ভে অনভ্যাসজনিত অসুবিধা ও নানাবিধ বাধাবিপত্তির উদ্ভব স্বাভাবিক; তদুপরি ইহাতে যে ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন হইবে তাহার ফলেও সাময়িক তথাকথিত দুঃখকষ্টের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। পরিণামে যে অনাবিল প্রকৃত সুখ যে স্থায়ী শান্তিলাভ হইবে তাহার জন্য এই জাতীয় ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইতেই হইবে। ক্রমে এমন সময় আসিবে যখন পরোপকার, পরের শুভেচ্ছা-কামনা স্বভাবগত হইয়া দাঁড়াইবে; তখন পরহিত কামনা সহজ, সরল ও অনায়াস হইয়া উঠিবে।

সূক্ষ্মবিচারের মানদণ্ডে জীবনকে কতিপয় অভ্যাসের সমষ্টি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কি উপাদানে এই অভ্যাসসমষ্টি জীবন্ত হইয়া উঠিবে, তাহা প্রত্যেক মানবেরই নিজ নিজ ক্ষমতা, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও আগ্রহ প্রভৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই সদ্‌গুরুর পরিচালনা লাভ করিলে অনায়াসে এই জীবনকে আদর্শ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে। এই সত্য হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, প্রেম ও সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ মানুষের পক্ষে নিতান্ত আকাশকুসুম নহে। দুষ্কর বা দুশ্চর সাধনা একেবারেই নয়।

'রামকৃষ্ণ-সেবা-সঙ্ঘ' জাতীয় অনেক প্রতিষ্ঠানেরই মূলে রহিয়াছে এই প্রেম ও সেবাধর্ম্মের অনুপ্রেরণা। ইহা যে কেবল অবাস্তব নীতি বা অনধিগম্য আদর্শই রহিয়া গিয়াছে

এমন নহে। এই পুণ্যব্রতের উদ্‌যাপনও অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি। এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান-সমূহের উপর, এই সেবা-ব্রতীদের উপর ইহার কি প্রভাবই না পরিলক্ষিত হয়! উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাননিচয়ের শান্তিচ্ছায়াতলে স্থানলাভ করিবার সৌভাগ্য একদিনের জন্যও যাঁহার হইয়াছে, তিনিই প্রেম ও সেবা-ধর্ম্মের পুণ্যপ্রভাব ও অনাবিল আনন্দরসের সুকুমারস্পর্শ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পুণ্যধামে ঐহিক অর্থ-সম্পদের বিন্দুমাত্র স্থানও নাই। যাঁহারা প্রেম ও সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা বিনিময়ে প্রতিদানের কোন প্রত্যাশা রাখেন না,—এমন কি কৃতজ্ঞতারও না। তাঁহাদের দান—বিশ্বপ্রকৃতির মত নিঃস্বার্থ ও মাতৃমমতামণ্ডিত,—তাঁহাদের মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র, তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রাণের ধর্ম্ম। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে এই সমস্ত আশ্রমের সংস্পর্শে একবার যিনি আসিয়াছেন, যিনি ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন; তাঁহারই অন্তরের সঙ্গে ইহার এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে; তাঁহাদের প্রেমমুগ্ধ আত্মা যেন প্রাণের ঠাকুরের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন, কি যেন কি একটা স্বর্গীয় বন্ধনে তাঁহাদের অন্তর, মন, বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

প্রেম ও সেবাধর্ম্মকে যিনি পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের অস্তিত্বানুভূতি ও আশীর্ব্বাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া কর্ম্মবহুল জীবনের পথে চলিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার জীবনসংগ্রামে বিজয়লাভ সুদূর-পরাহত নহে; জীবন-সংগ্রামে

তিনি জয়ী হইবেনই—কণ্টকের নির্ম্মম প্রহারকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তিনি স্বভাবসুন্দর কমলের সন্ধান পাইবেনই। হয় তো বা কোন অদূরদর্শী বলিয়া বসিবে, এই মধুর প্রেম ও সেবাধর্ম্ম স্বকীয়তার পরিস্ফুরণে, ব্যক্তিত্ববিকাশে এবং চিত্তবৃত্তিসমূহের স্বাধীন উন্মেষে ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই যুক্তির ভিতর কোনরূপ সত্যের আভাস বা স্পর্শ পাওয়া যায় না।

যদি ধরিয়া লই মানব-জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, সৎপথে থাকিয়া স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিসমূহের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্য চেষ্টা করা, তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে জগতে কোন ব্যক্তিই প্রেম ও সেবাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়া দশের তথা দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ এমন কি আংশিক উন্নতি সাধন করিতেও সমর্থ হ'ন নাই। যে ব্যক্তি নিজেকে চিনিতে পারে না, নিজের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিমাপ সম্বন্ধে যে অজ্ঞ, কি করিয়া সে বিশ্ব-মঙ্গলের পুণ্যক্ষেত্রে আপনাকে নিয়োগ করিবে? নিজেকে চিনিতে হইলে, নিজেকে জানিতে হইলে, নিজের ব্যক্তিত্বের ভিত্তিকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে হইলে প্রেম ও সেবাধর্ম্মের পুণ্যহাটে আপনাকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে কি কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়? সর্ব্বমঙ্গল-ময়ের করুণার বীজ যে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়—তাহাই একদিন কল্পবৃক্ষে পরিণত হইয়া তাহার ঈপ্সিত অমৃতময় ফলপ্রসব করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সরোজিনী নাইডুর জীবনাবলী এই সহজ সুন্দর সত্যের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান। ইঁহারা প্রত্যেকেই সেবা-মন্দিরে প্রেমদেবতার পূজারী ; এই মন্দিরেই কেহ কেহ মঙ্গল সন্ধ্যারতির ঐক্যতানে তান মিশাইয়া বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে মিলাইয়া গিয়াছেন এবং কেহ কেহ অদ্যাবধি প্রেমের ঐক্যতানের মূর্চ্ছনায় বিমোহিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। ইঁহাদের ব্যক্তিত্ব তো কোথায়ও ক্ষুণ্ণ বা ম্লান হয় নাই। পরন্তু অনন্তকালের ললাটপটে ইঁহাদের প্রেম ও সেবাধর্ম্মের নীতিনিচয় স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া আছে।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের কর্ণধার হের হিটলার বাহ্যিক দৃষ্টির সম্মুখে নিষ্ঠুর দয়ামায়াহীন দানব বিশেষ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে ; কিন্তু প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তাঁহার প্রেম ও সেবাধর্ম্মের গৌরব উদ্ভাসিত হইবেই। এই গৌরবকে তিরস্কৃত করিয়া রাখিবার উপায় নাই।

জগতে যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন তিনিই প্রেম ও সেবার সঙ্গমতীর্থে অবগাহন করিয়া নিজের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন। চরিত্রগঠন করিতে হইলে প্রেম ও সেবাধর্ম্মকে আমরা কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারি না। যে ইহার প্রভাব হইতে শতহস্ত দূরে থাকিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করে সে ব্যক্তি যে কত নিরুপায়, কত

অসহায় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তাহার নৈতিক জীবনের কারখানা যে নীলামে উঠিয়া বসিল, তাহার বহু তপস্যালব্ধ মনুষ্যজন্ম যে বিনামূল্যে পশুরাজ্যের ব্যাপারীদের কাছে বিকাইয়া গেল, অবিদ্যার মোহে তাহা কি সে বুঝিতে পারিল ?

আমরা যদি দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর ভিতরে সুখের স্বাদ পাইতে ইচ্ছা করি, যদি সাহিত্যিক হিসাবে নিজেদের যশঃসৌরভে ইহলোককে আমোদিত করিতে ইচ্ছা করি, যদি বক্তাহিসাবে সুনাম অর্জ্জন করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতে অভিলাষ করি, যদি রাজনীতির জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার আশা পোষণ করি, তাহা হইলে প্রারম্ভেই আমাদের প্রেম ও সেবাধর্ম্মকে জীবনের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে। নতুবা আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, তুলসীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিরা প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একদিকে যেমন সাধন-জীবন গঠন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রেমঘন কাব্য রচনা করিয়া জগতে অমরতা লাভ করিয়াছেন—তাঁহাদের কাব্য পাঠ করিয়া আজিও কত লোকে প্রেমে দীক্ষা লাভ করিতেছেন এবং তাঁহাদের আদর্শে সাধকজীবন গঠন করিতেছেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা প্রত্যেক নরনারীর অন্তরাত্মায় অপরিসীম ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ক্ষমতাবলীর সম্যক্ পরিস্ফুটনই মানবজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষ যখন

পশুশক্তিকে সমূলে বিনাশ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সে নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে—চিরদিনের জন্য সে জগতের নমস্য হইয়া থাকে।

৩০৲ টাকার চাকুরীজীবী শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত সংসারের জন্য ব্যয় করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ইহার বাহিরে আর সে যাইতে পারে না, অন্যকে দশটি টাকাও ধার দিতে পারে না। সেইরূপ আমার মনোজগতের সঙ্গতিও যদি যৎসামান্য হয়, তবে কি করিয়া আমি অন্যকে সাহায্য দিব, কি করিয়া আমি অপরের কাছে শ্রীভগবানের এই গহন সৃষ্টি-রহস্য সমাধান করিব। আর অপরেই বা কেন আমার কাছে হাত পাতিবে? কেনই বা আমাকে উপদেষ্টা মনে করিয়া আমার আদর্শকে সত্য বলিয়া পূজা করিবে? ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'A man is known by the company he keeps'—কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য হইলেও আমরা ইহাকে নূতন করিয়া বলিতে চাই 'A man is known by the mode of his living.' যে ব্যক্তি মহান, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ যাহার মধ্যে বিদ্যমান, দারিদ্র্যের শত কশাঘাতেও তাহার আত্মশক্তি মলিন হইয়া যায় না, জ্ঞানদীপ্তি তাহার ললাটে সর্ব্বক্ষণের জন্যই দেবাদিদেবের তৃতীয় নয়নের মত প্রজ্বলিত থাকে। জ্ঞানের এই দীপশিখা চিরপ্রজ্বলিত রাখিতে হইলে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ লইয়া মনুষ্যসমাজে দাঁড়াইতে হইলে সর্ববিধ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আমাদের

প্রেম ও সেবা-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে। নিজেকে বিলাইয়া দিতে হইবে দেশের সেবায় ; দশের স্বার্থের বেদীমূলে নিজের স্বার্থ বলিদান করিতে হইবে।

'বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে' গ্রাম্য কবি এই বাণী বহুদিন পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মানবত্বের নিদর্শন বিনয় ; বিনয়ই মানবত্বের উচ্চ সৌধশিখরে আরোহণের প্রথম ও প্রধান সোপান। যে গর্ব্বিত, যে উদ্ধত, যে স্বার্থান্ধ, যে পরশ্রীকাতর সে মনুষ্য-নামের অযোগ্য ; সে হতভাগ্য মনুষ্যত্বের দাবী ও অধিকার হইতে চির-বঞ্চিত। সহজ সারল্য বিনয়েরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত শাশ্বত সত্য। সারল্য হইতেই বিনয়ের জন্ম। মানবত্বের চরণপদ্মে বিনয়-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইলে স্বার্থপরতার ও নীচতার ধূলিকলঙ্কিত বস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক প্রেম ও সেবাধর্ম্মের শুভ্র উত্তরীয় পরিধান করিয়া প্রাথমিক আত্মশুদ্ধি পর্ব্ব সমাধান একান্ত আবশ্যক। মানব-জীবনের ক্রমবিকাশের উপর সৎ অসৎ প্রত্যেক কার্য্যেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রেম ও সেবার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সর্ব্বজীবে প্রেম ও সেবার বিনিময়ে আমাদের জীবন ক্রমশই মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হয়। প্রেম ও সেবার ভক্ত পূজারী মানবপূজার জন্য যে অর্ঘ্য নিবেদন করে, তাহার পুরস্কার সে সঙ্গে সঙ্গেই পায়। পূজা-মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যে তাহার মন কানায় কানায় আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহাই তাহার পুরস্কার, সে যাহা দেয় তাহার

বহুগুণ ফিরিয়া পায়। একই জগৎপিতার সন্তান আমরা, একই বিশ্বনিয়ন্তার সমবিধিসূত্রে আমাদের জীবন গ্রথিত। তাঁহার সন্তানবর্গের পরিতৃপ্তিতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি, তাহাদের সেবাই তাঁহারও পূজা। এই জন্যই নরনারায়ণ-সেবা মানব-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্রত।

অবিরত বেদনার খরতাপে দগ্ধ শুষ্ক মরুময় জীবন যাহার দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে, প্রেম ও সেবার মায়ামন্ত্রে তাহার জীবনেও প্রাণের প্রবাহ বহে,—দুঃখ-কষ্টের তীব্র দাহও তাহার মিলাইয়া যায়। যদি বন্যবর্ব্বরের ন্যায় কেবল মাত্র নিজের সত্তাটুকু লইয়াই বাঁচিয়া থাকা জীবনের কাম্য না হয়, যদি আত্মহারা হইয়া পরহিতব্রতে নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া যায়, তবেই স্বকীয় দুঃখ শোকের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব। যিনি একবার প্রেম ও সেবার অমৃতধারা পান করিয়াছেন, তিনিই এই উক্তির যথার্থ্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

প্রেম ও সেবার মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত, জীবনের গতি যাহার এই নীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত, তিনি ভিখারী হইলেও প্রকৃত সম্পদের অধিকারী হইয়া শান্তিতে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। যিনি যক্ষের ন্যায় কেবল স্বীয় সুখসমৃদ্ধিকেই আঁকড়াইয়া না থাকিয়া পরকায় মঙ্গল-সাধনে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের গোপন-রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ের সম্মিলিত প্রকৃষ্ট পন্থার অনুসন্ধান পাইয়াছেন। শুধু

রক্তমাংস-সম্পর্কিত কতিপয় আত্মীয়স্বজন লইয়াই যাহার সংসার, নিখিল বিশ্বের পরিধি যাহার এত সঙ্কীর্ণ, যথার্থ সুখের সন্ধান তাহার মিলিবে না; সেই দিশাহারা হতভাগা সুখ পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মরুভূমির ভ্রান্ত পথে ঘুরিয়া মরিতেছে,—তাহার তৃষ্ণা মিটিবার নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা আমার দৃষ্টিপথে পড়ে। ট্রেণে চড়িয়া পশ্চিম অঞ্চলের দিকে চলিতেছিলাম। সেইদিন দারুণ-গ্রীষ্মের দাহনে ট্রেণের যাত্রিবৃন্দ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই দারুণ কষ্ট বোধ করিতেছিল এবং বৈচিত্র্যহীন ভ্রমণে কেহই তৃপ্তি পাইতেছিল না। অকস্মাৎ একটি বর্ষীয়সী ভদ্র মহিলা একটি দশ বারো বৎসরের বালিকার হাত ধরিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। ছোট মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের হিল্লোল খেলিয়া যাইতেছিল, তাহার কণ্ঠে ছিল বীণার সুমধুর ঝঙ্কার। ইহারা উপবেশন করিবার অনতিকাল পরেই মেয়েটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই বালিকাটি চমৎকার বাঁশী বাজাইতে জানিত। বাঁশীতে তান দিতেই পার্শ্বস্থ চশমাধারী বৃদ্ধটী উৎসুক নয়নে চাহিয়াই রহিলেন—হস্তস্থিত সংবাদপত্রখানি কখন খসিয়া পড়িয়া গেল তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। ধীরে ধীরে বৃদ্ধটী পারিপার্শ্বিক অবস্থিতির কথা ভুলিয়া গিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে কামরার সকল যাত্রীই একই দশা প্রাপ্ত হইল, কে সবার আগে মেয়েটীর সুন্দর

হাসির অধিকারী হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে, ইহা লইয়া আরোহীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল।

এই হাস্যময়ী বালিকার মধুর সংস্পর্শে সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্ম-জনিত অবসাদ-মালিন্য, ক্লান্ত নীরস ভাব—সবই কোথায় নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। যাইবার সময় ছোট-বালিকাটি তাহার সুগঠিত সুন্দর হস্ত সঞ্চালনে বিদায় অভিনন্দন নিবেদন করিতেই যাত্রিবর্গও অনুরূপ শেষ সম্ভাষণ জানাইল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুইটী গবাক্ষপথে বালিকাটির পথপানে যতদূর দৃষ্টি যায় সাগ্রহে অপলকনয়নে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল সমগ্র ট্রেণখানির উপর দিয়া বিদ্যুতের লীলা চলিয়া গেল, সমগ্র কক্ষটীর বুকে যেন মধুর হিল্লোল বহিয়া গেল। আমার সহযাত্রীরা সকলেই অভিনব প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন, এক অনুপম তৃপ্তির আনন্দে তাহারা আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। ট্রেণের যাত্রীদের মধ্যে যে ভাবটির উদয় হইল, আমাদের নানা-তাপ-সন্তপ্ত সাংসারিক জীবনে প্রেম ও সেবা মাধুরীই সেই ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ চিত্তবিমোহন অনাবিল মাধুরী-ধারা প্রেম ও সেবার উৎস হইতেই প্রবাহিত হয়।

মানবের আচার ব্যবহারের উপরেও প্রেম ও সেবার মঙ্গলময় প্রভাব উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত সামাজিক শিষ্টাচার এই মহা-নীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, এই নীতিই মানবকে দয়া, স্নেহ প্রীতি, মৈত্রী ও সর্ব্বাঙ্গীণ শিষ্টতায় মহীয়ান্ করিয়া তোলে, এই পুণ্যনীতি যাঁহার জীবনে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত—প্রেম

ও সেবাই যাঁহার জীবনে শ্রেষ্ঠ ব্রত, তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী।

অপর পক্ষে যে ব্যক্তি স্বার্থপর, স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতেই যাহার জীবন ও দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সে মুখোষ পরিয়া বাক্‌চাতুর্য্যে যতই পরহিতৈষণা প্রচার করুক না কেন, তাহার প্রকৃত স্বরূপ একদিন না একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তাহার সংস্পর্শে যে কেহই আসিবে সেই ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইবে।

কথিত আছে, স্কটল্যাণ্ডবাসী কবি রবার্ট বার্ণসের চেয়ে ভদ্র শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তি তদানীন্তন স্কটল্যাণ্ডে আর কেহ ছিলেন না। কৃষিক্ষেত্রেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাটিয়া গিয়াছে। স্বীয় পল্লী ছাড়িয়া কদাপি তিনি সহরের কোলাহলময় জীবনের সংস্পর্শে আসেন নাই, কেবলমাত্র জীবনের সায়াহ্নে তিনি একবার রাজধানী এডিনবারায় তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাসমূহের পাণ্ডুলিপি লইয়া গমন করিয়াছিলেন। তথায় যে কেহ তাঁহার সান্নিধ্যে আসিল সেই যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল। তিনি ছিলেন প্রেমের পূজারী, সাম্যের পতাকা হস্তে এই চারণ কবি গাহিয়া গিয়াছেন ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব্ব মিলনসঙ্গীত। একদিন তাঁহারই কণ্ঠে ভ্রাতৃত্বের এই অপূর্ব্ব মিলনগীতিকা শ্রবণে নিখিলজগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল :—

'আসিবে সে দিন আসিবে

মানুষ মানুষে সহোদর সম প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে।

যথার্থ ভদ্রতা ও শিষ্টাচার মানবের অন্তরের সম্পদ, ইহারা প্রেম, দয়া ও সেবার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত। একমাত্র প্রেম ও সেবার ভাষাই নিখিল বিশ্বের সার্ব্বজনীন ভাষা। জাতিবিশেষের কোন ভাষাই আর এত ব্যাপক নহে। পরিচিত অপরিচিত নির্ব্বিশেষে সকলেরই সঙ্গে যিনি সহৃদয় ব্যবহার করেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের নাগরিক। মূক প্রাণিগণ পর্য্যন্ত তাহার মায়া মমতায় বশীভূত হয়।

মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য দায়িত্বও এই কারণে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মূক অসহায় জীবজগতের প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে। তাহাদেরও সুখদুঃখ বোধ আছে। শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই মানুষের উচিত, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণীদের উপর অধিকতর করুণা প্রদর্শন করা। আবার যে হতভাগ্য ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি, অক্ষমতা, দৈহিক অঙ্গহানি প্রভৃতি দুর্ব্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাদের প্রতিও কি আমাদের অধিকতর সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নয়? সংক্ষেপে বলিতে গেলে মূক অসহায় প্রাণিগণ আমাদের মুখের ভাষা বুঝিতে না পারিলেও আমাদের প্রাণের ভাষা বুঝিতে পারে, তাহাদেরও প্রাণ আছে, সেই জন্য প্রাণি-মাত্রকেই ভালবাসা শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসা মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? কারণ, এজগতে নীচ, কদর্য্য-স্বভাব, হানচেতা মানুষ নিতান্ত বিরল নহে। এতদ্ব্যতীত মানুষে মানুষে

রুচি-বৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন-রুচিসম্পন্ন কিংবা বিকৃতচরিত্র মানুষকে প্রেম ও সেবা বিতরণ কি সম্ভবপর? যাহার দৈহিক পঙ্গুতা আছে তাহাকে আমরা যেমন করুণা করি—যাহার নৈতিক অঙ্গবৈকল্য তাহাকেও তেমনি করুণা করা আমাদের কর্ত্তব্য। অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু ব্যক্তি আমাদের করুণার পাত্র। যে মনে, বুদ্ধিতে ও নৈতিক জীবনে অন্ধ বা পঙ্গু সে আরও বেশি কৃপার পাত্র, একথা মনে রাখিতে হইবে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মানুষ মাত্রই অল্পবিস্তর আকাঙ্ক্ষিত গুণের অধিকারী। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকেই, তাহার রুচি যতই নীচ হউক না কেন. ভালবাসা মানুষের পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নহে।

এই প্রসঙ্গে ৺কামিনী রায়ের কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পতিত, অধম, স্খলিতপদ ব্যক্তিও যে প্রেম ও সেবার পাত্র—কবি তাহা অতি সুন্দর রূপেই বুঝাইয়াছেন—

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার,
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে?
তাই তার আর্ত্ত রবে সকলে বধির হবে
যে যাহার চলে' যাবে চাহিবে না ফিরে?
বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে
পথে নিভে গেছে আলো, পিছে পড়ি তাই,
তোমরা কি দয়া ক'রে তুলিবে না হাতে ধ'রে
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না ভাই?

তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া
তোমাদেরি হাত ধ'রে হোক অগ্রসর,
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তা'রে
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।"

মানুষ হইয়া যখন জন্মিয়াছে তখন মানুষের সৎবৃত্তিও তাহার মধ্যে ছিল—তাহা যদি আজ গ্রীষ্মের প্রখর দহনে দূর্ব্বাক্ষেত্রের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গিয়া থাকে—তবে আষাঢ়ের নবধারাপাতের ন্যায় তোমার প্রেম ও সেবার মাধুরীধারা কি তাহাকে আবার সঞ্জীবিত করিবে না? বিবেকের বর্ত্তিকা প্রত্যেকের হাতে দিয়াই বিধাতা প্রত্যেককে এই সংসার-পথে প্রেরণ করিয়াছেন—পথে যদি কাহারও বর্ত্তিকা নিভিয়া গিয়া থাকে—তবে তাহার সাথীরা কি তাহাদের বর্ত্তিকা হইতে সেই হতভাগ্যের নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকা আবার জ্বালিয়া দিবে না? যে ব্যক্তি মহান্, পুণ্যাত্মা—সকলেই তাহার পূজা করে, তাহাকে শ্রদ্ধা করে—তাহা যে ধর্ম্মসাধনেরই অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু যাহাকে কেহ ভালবাসে না—তাহাকে যে ভালবাসিতে পারে—সকলে যাহাকে উপেক্ষা করে তাহাকে যে শ্রদ্ধা করিতে পারে—যে অমানী তাহাকে যে মান দিতে পারে—সে এ জগতে ধর্ম্মবীর। এই শিক্ষাই খৃষ্ট শ্রীচৈতন্য দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদের দমন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খৃষ্ট চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই পাষণ্ডদেরই উদ্ধার করিবার জন্য প্রেম বিতরণ করিয়া। ইহলোকের কথা

ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয় সাধুরা নিজের পুণ্যেই পরলোকে তরিয়া যায়। দুর্জন যাহারা তাহাদেরি পাথেয় ও খেয়ার কড়ির অভাব। দুই দিনের এই ইহলোক; চির দিনের পরলোকে তরিয়া যাইবার জন্য পাষণ্ডকে যে প্রেমধন দান করিতে পারে—এ জগতে সেই ধন্য।

আবার দুর্জ্জন যখন পাপে মগ্ন, তখন যদি তাহাকে প্রেম দিতে নাই পার—সে যখন অনুতপ্ত তখন-ত তাহাকে ভালবাসিয়া আপনার করিতে পার। যত পাপিষ্ঠই হউক মানুষের এমন সময় মাঝে মাঝে আসে যখন সে অনুতপ্ত হয়—কিছুকালের জন্যও পাপে বিরত হয়,—দারুণ দণ্ড বা প্রতিফল পাইয়াও তাহার চিত্ত কোমল হয়। তাহার জীবনে সেইগুলি মাহেন্দ্রক্ষণ। এই মাহেন্দ্রক্ষণগুলির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়াও তাহাকে বুকে টানিয়া আপনার করিয়া লওয়া যায়—প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে চিরদিনের জন্য তাহাকে বাঁধিয়া ফেলা যায়। পাপী যখন লজ্জা পায়—তখন কি মুখ ফিরানো উচিত? কবি তাই বলিয়াছেন—

পথ ভুলে গিয়াছিল—আবার এসেছে ফিরে
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে লাজে ভয়ে নতশিরে।
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে হাতে ধরে ওরে তোরা আন ডাকি।
ফিরাস্ নে মুখ আজ, নীরব ধিক্কার করি'
আজি আন স্নেহসুধা লোচন বচন ভরি।

অতীতে বরষি ঘৃণা—কিবা আর হবে ফল ?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি হাত ধরে লয়ে চল।
স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে, আন ওরে ডেকে আন।
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ বাহু পাশে,
বেঁধে ফেল, আজ গেলে আর যদি নাই আসে।
দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণা-ক্রোধ
একটি জীবন তোরা হারাবি জীবন শোধ।

(আলো ও ছায়া)

একটি আত্মা যদি তোমাদের সম্মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা নরকস্থ হইতে চলে—আর তোমাদের প্রেম মৈত্রী করুণার গুণে যদি তাহা পরিত্রাণ পায়—তবে কি তাহাকে রক্ষা করা তোমাদের উচিত নয় ? একটি আত্মাও যদি পতন হইতে রক্ষা পায় তবে স্বর্গে দুন্দুভি বাজে—মহামহোৎসব চলিতে থাকে। বাইবেলের অন্তরের কথাও ইহাই।

মনে রাখিতে হইবে—অধিকাংশ পাপ বা পদস্খলন অজ্ঞতা হইতেই জন্মে। অজ্ঞতা অপরাধ নয়। সমাজের মধ্যে যদি কেহ অজ্ঞ থাকে—তবে তাহা সমাজের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞ তাহাদেরি দোষে।

অজ্ঞতা আর দুরভিসন্ধি এক নহে। অধিকাংশ ভুলত্রুটি পাপাদির জন্য ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা সমাজ ও রাষ্ট্রই দায়ী। মানুষ সুখলাভের আশায় বিশেষ বিশেষ কর্ম্মপন্থা বাছিয়া লয়। এই সুখশান্তির আশাতেই অনেক সময় সে ভ্রান্ত

অন্যায় পথে চলিতে থাকে সে যাহা পাইবার আশা করে ন্যায় পথে চলিলে তাহার প্রাপ্য হয় অনেক বেশী, সে ভুলিয়া যায় অথবা সে জানিতেই পায় নাই যে প্রকৃত সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি মানবজীবনের যত কিছু কাম্যবস্তু, কেবলমাত্র সদুপায়েই সম্ভব। অজ্ঞতা হইতেই এই সকল পাপ জন্মে—পাপকার্য্যই তাহাদের কাম্য নহে—সুখশান্তিই তাহাদের কাম্য। তাহারা যদি জানিত এপথে সুখশান্তি পাওয়া যাইবে না—তাহা হইলে তাহারা ঐ পথে কিছুতেই যাইত না।

মত ও পথ ভিন্ন হইলেও জীবনের উদ্দেশ্য যে আমাদের সকলেরই এক, ইহা কখনও ভুলিলে চলিবে না। আমাদের সকলেরই সুখ শান্তি ও আনন্দলাভের জন্য এক তীব্র পিপাসা রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা সকলের সমান নহে। জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় লাভের পন্থাও তাই সকলের এক নহে।

জ্ঞানবৈষম্য হইতেই, বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি। যদিও আমরা সকলে আসলে একই, আমরা সকলে সেই অনাদি অনন্তেরই এক এক অংশ, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অসীম সম্ভাবনা (Potentiality) রহিয়াছে। তথাপি মানুষে মানুষে চেতনা ও ক্রম বিকাশের বৈষম্য বর্ত্তমান আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম ও ক্রমবিকাশ সাধনেই জীবনের লক্ষণ সূচিত হয়, সাধনা ও বিকাশ একই সূত্রে গাঁথা,—এই চির শাশ্বত

সত্যটি স্মরণ রাখা মানবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ম্মই জীবন, প্রেমধর্ম্মকেই যেন আমরা জীবনের আদর্শ মনে করিয়া জীবনকে কর্ম্মময় করিয়া তুলিতে পারি।

পল্লীগ্রামে আমার যে কুটীরখানি আছে, এক শীতের দিনে দেখি, তাহার দ্বারের পার্শ্বস্থ উদ্যানের গোলাপগাছটী কলিকা সম্ভারে সুশোভিত হইয়া আছে। গণনা করিয়া দেখিলাম, কলিকাগুলি সংখ্যায় বিংশতির-ও অধিক। কয়েকদিন পরে গুটি দশেক কুঁড়ি সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আরও দুই তিন সপ্তাহ পরে শীর্ষস্থ কলিকাসমূহ বিকশিত হইল, অবশিষ্ট কতিপয় কলিকা প্রায় একমাস কাটিয়া গেলে প্রস্ফুটিত হইল। যে কুঁড়িগুলি অনেক পূর্ব্বেই সুপরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় এই অপরিণত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কলিকাগুলি অবশ্যই পরাজিত হইয়াই ছিল। কিন্তু পরিশেষে একদিন আসিল যখন এই পরবর্ত্তী সোপানের কলিকা সমূহের মধ্যে দুই একটি সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও গন্ধগৌরবে সত্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। যে অসীম সম্ভাবনা এই পরবর্ত্তী কলিকাগুলির অভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহাই ভাবী কালে আপনাকে বিকাশ করিয়া সার্থক হইল। এই অসীম সম্ভাবনার ক্রম পরিণতি-প্রাপ্তি ধীরগতি হইলেও তুচ্ছ করিবার নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রত্যেক মানুষের ভিতরই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ লুক্কায়িত আছে। সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি লইয়াই মানুষ মানবত্ব অর্জ্জনের

পথে অগ্রসর হয়, কুপ্রবৃত্তি যে বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করে, তাহাকে অপসারিত না করিলে মানবত্বের বিকাশ অসম্ভব। এই বিঘ্ন বাধাই মানবকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি যথার্থ মানব, তিনি প্রিয়দর্শী, মানবত্বের পূজারী, তিনি মানব মাত্রেরই অন্তর্নিহিত সুপ্ত মহত্ত্বের সন্ধান জানেন, এই সুপ্ত মহত্ত্বকে জাগ্রত করাই তাহার ধ্যান, তাহার সাধনা, তাহার তপস্যা। মানবের এই আভ্যন্তরিক অনন্ত সম্ভাবনাকে পূর্ণাভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে সহায়তা করাই ধর্ম্ম। মানবসুলভ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মানুষকে অবহেলা করিয়া নিরুৎসাহ করা ধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

প্রেম ও সেবার মধুস্পর্শে মানবের মরুময় জীবনেও প্রাণের প্রবাহ আনয়ন করা যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। সহানুভূতি ও সমবেদনার মায়ামন্ত্রে ধ্বংসোন্মুখ মানুষকেও আবার জীবনের পথে ফিরানো যায়।

অবশ্য নিজ নিজ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপন আপন চরিত্রকে অক্ষত রাখিয়া পরে পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করা একান্তই আবশ্যক। আত্মশুদ্ধি না হইলে পরকীয় মঙ্গল সাধন সম্ভব নহে; অনুন্নতের উন্নতি সাধন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, স্বীয় চরিত্র যেন মালিন্যে কলুষিত না হয়।

জাগরণ

সামাজিক সমস্যা পুরুষানুক্রমে মানবজীবনের উত্থানপতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কর্ম্মবহুল জীবনের পথে কর্ম্মকেই আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া জাতির পর জাতি সামাজিক নিত্য নূতন সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির মধ্যে রুচি বৈচিত্র্যের ও বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন সমস্যা ও মতবাদের সৃষ্টি ও উৎপত্তি অনিবার্য্য। মত পথ ভিন্ন হইলেও কর্ম্মকে মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া সমগ্র জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেনও। আজও পৃথিবীর বুক হইতে কর্ম্মের প্রেরণা মুছিয়া যায় নাই; যায় নাই বলিয়াই ইউরোপ ও আমেরিকা সসাগরা ধরিত্রীর উপর নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কর্ম্মের প্রেরণা, উদ্দীপনা সামাজিক ও রাষ্ট্রগত সমস্যাই কর্ম্মকে চির আয়ুষ্মান করিয়া রাখে; কর্ম্মের কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথসমূহ অনায়াসেই নিষ্কণ্টক ও কুসুমাকীর্ণ হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজসেবা সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরের সেবারই নামান্তর। তাঁহার সেবা করিতে হইলে তাঁহার সন্তানসন্ততির সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এদেশে দরিদ্র-নারায়ণ সেবার কথা সর্ব্বত্র

বিদিত। দরিদ্রের মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজ করেন এই ধারণায় জন-সেবা না করিলে সেবকের মধ্যে অহংভাব আসিয়া সেবাভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে সেব্য ও সেবক উভয়েরই ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। জগদ্‌বিখ্যাত দার্শনিক হেকেলের মতে, নীতিবাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য যুগপৎ আত্মপ্রীতি এবং পরের প্রীতি সাধন করা। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, মানুষ সামান্য কিছু করিয়াই স্বীয় মহিমা দুন্দুভিনিনাদে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার করিতে থাকে। পবিত্র দেববিগ্রহস্থাপনের নামে নীচ, স্বার্থান্ধ কপট লোকেরা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রেমের উদ্দীপনার অজুহাতে লোকসমাজকে প্রতারিত করিয়া নিজেদের অর্থাগমের পথ আবিষ্কার করিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাহারা প্রাসাদতুল্য মঠমন্দির স্থাপন করিয়া দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ বিগ্রহকে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছে। আবার এই সমস্ত ব্যক্তিরাই বিশাল জনসভায় ভগবৎ প্রেম ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রেমের অশ্রুতে বক্ষ ভাসায়, ইহাতে তাহাদের তথাকথিত ভিক্ষার পথ সুগম হইয়া দাঁড়ায়, ব্যাঙ্কের তহবিল অনায়াসেই বাড়িয়া যায়। শুধু ইহাতেই তাহারা ক্ষান্ত হন না। শোভাযাত্রা করিয়া দলে দলে ভক্ত পূজারীর বেশে নগর-কীর্ত্তনে বাহির হন, এবং নানা প্রকারে ভক্তের অভিনয় করিতে থাকেন।

এই জাতীয় অনুষ্ঠান হইতে সমাজ একবিন্দুও উপকার পায় নাই; ইহাতে দারিদ্র্যের যন্ত্রণার ও দুঃখকষ্টের জ্বালা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, প্রেমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের সেবা এই জাতীয় অনুষ্ঠান হইতে কখনও হয় নাই এবং কখনো হইবে না— ইহা চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্য। তাঁহার সেবার পথ তাঁহারই বিধানে আমাদের জীবনে বিস্তৃত। কবির কাণে কাণে তিনি বলিয়াছেন—

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"

এই সত্যের সেবা আমাদের সর্ব্বথা কাম্য। এই সত্য যাহার মধ্যে চিরপ্রবুদ্ধ সে-ই মানুষ, মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে সে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। আর্ত্ত, দুর্গত, দুঃস্থরাও তাঁহারই সৃষ্টি; তাঁহার সৃষ্টির একবিন্দু করুণা জগৎকে জীবনরসে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, একই বিশ্ব-নিয়ন্তার সম-বিধি সূত্রে আমাদের জীবন গ্রথিত। ভ্রাতৃত্বের চিরমধুর বন্ধনে আমরা বিধাতার হাতেই আবদ্ধ। নিজের ভাইকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহার দুঃখকষ্ট-নিবারণের চেষ্টা পাইলে আমাদের পিতা কি সন্তুষ্ট হইবেন না?— মুমূর্ষুর সেবা করিয়া যখন আমরা গৃহে ফিরিব, তখন নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব যে তাঁহার পরিতৃপ্তি-প্রসূত করুণা আমাদের শতচ্ছিদ্র কুটীরখানিকে স্বর্গীয় মহিমার সুষমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

যখনই আমি ঈশ্বরসেবার প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিতে গিয়াছি,



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

তখনই নর-নারায়ণের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তৃষ্ণার্ত্তকে একবিন্দু জলদান, ক্ষুধার্ত্তের মুখে এক মুষ্টি অন্নপ্রদান, বহু অর্থব্যয়ে দেবমন্দিরনির্ম্মাণ ও দেববিগ্রহকে স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত করার চেয়ে শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তৃষ্ণার্ত্তকে একবিন্দু জলদান করিলে ভগবানের প্রকৃত সেবা হইবে—তিনি পরিতৃপ্ত হইবেন। দীনের মুখের অন্ন কাড়িয়া রাজসিক উৎসবে ব্যয় করিলে উৎসব-দেবতা কখনও পরিতৃপ্ত হ'ন না। আর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া যে গর্ব্বিত মূঢ়জন দেবমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে হাজার হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়া তথাকথিত দানবীর বা প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহার ইষ্টকশিলাময় দম্ভগৃহে পরমেশ্বরের আবির্ভাব অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের 'দীনদান' বলিয়া একটি কবিতা আছে, সেই কবিতাটি এইখানে তুলিয়া দিতেছি। প্রকৃত উপাসনা কাহাকে বলে কবি তাহা এই কবিতাটিতে দেখাইয়াছেন।

নিবেদিল রাজ্যভক্ত, "মহারাজ, বহু-অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না ল'য়ে আশ্রয় হায় পথপ্রান্তে তরুছায়াতলে
করিছেন নাম-সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তারে দর দর উদ্বেলিত আনন্দ-ধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি, শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন, ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি,
সহসা কমল-গন্ধে মত্ত হ'য়ে দ্রুত পক্ষ মেলি

ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্মের কাননে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেই মতো নরনারীগণে
সোণার দেউল পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
সেথায় পথের প্রান্তে ভক্তির হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্ন বেদিকার পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।"

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হ'তে নামি, গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে, কহিলেন, নমি তাঁর পায়ে
"হের প্রভু স্বর্ণশার্ষ নৃপতি-নির্ম্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয় তারে কেন করিয়া বর্জ্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে ব'সে!"
"সে মন্দিরে দেব নাই," কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে
"দেব নাই! হে সন্ন্যাসী নাস্তিকের মতো কথা কহ!
রত্নসিংহাসন পরে ঝলিতেছে রতন বিগ্রহ
শূন্য তাহা?"

"শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ," সাধু কহে
"আপনারে স্থাপিয়াছ জগতের দেবতারে নহে।"
ভ্রূকুঞ্চিয়া কহে রাজা, "বিংশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
করিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া
পূজা-মন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান

তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোন স্থান ?”
শান্তমুখে কহে সাধু, “যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়,
অরণ্যে গুহায় গর্ত্তে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়
অশ্বত্থ-বিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে। সে বৎসর
বিংশলক্ষ মুদ্রা দিয়ে রচি' ঐ স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে, সে দিন কহিল ভগবান,
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান,
অনন্ত নীলিমা মাঝে, মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য শান্তিময় প্রেম, দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান ?' চলি গেলা সেইক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন সাথে দীনের আশ্রয়
অগাধ সমুদ্র মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ।” রাজা জ্বলি' রোষানলে
কহিলেন—“রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্ত্তে চলি' যাও।”
সন্ন্যাসী কহিলা শান্তস্বরে—
“ভক্ত বৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্ব্বাসনে
সেইখানে মহারাজ নির্ব্বাসিত করো ভক্তজনে।”

জাতি যখন অনাচার ও অবিচারের কবলে পড়িয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় তখনই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষরা আবির্ভূত হইয়া জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ ক্ষমতা, ধীশক্তি ও স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যাই, তাঁহাদিগকে আমরা অবতার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ মহাত্মা দিগকে আমরা অসাধারণ মানব বলিয়াই মনে করি, তাঁহারা প্রেমের বাণী শুনাইয়া সমগ্র জগৎকে প্রেমময় করিয়া গিয়াছেন, সেবাকর্ম্ম যে পরম ধর্ম্ম তাহা আমাদিগকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্য আবির্ভাবে পৃথিবীর পাপ মুক্ত হয়। প্রেম ও সেবাধর্ম্মের আদর্শ বিশ্ব-মানবের অন্তরলোকে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। কবি তাই গাহিয়াছেন ঃ—

(ওরে) যার লাগি তোর কাঁদে রে প্রাণ
সেই তো ভগবান।
মন্দিরে তুই খুঁজিস মিছে
দেখ্ না খুলে প্রাণ ॥
এই তো আকাশ, এইতো বাতাস
সবার মাঝে তারই প্রকাশ
ও তুই সবার মাঝে
শুনিসনি কি তাহারি আহ্বান ?

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত আত্ম উপলব্ধি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে প্রেম ও সেবাধর্ম্মই একমাত্র পন্থা। এই মহানীতি যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা অনায়াসেই স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হয়।

মানুষের ধর্ম্মমূলক বৃত্তিগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক প্রেম ও ভ্রাতৃপ্রেমকে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করিয়াছি এবং দেখিতে পাইয়াছি যে এই ভ্রাতৃপ্রেমনীতি একটি জ্বলন্ত, জীবন্ত সত্যের অভিব্যক্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত এই সত্যনীতির অনুভূতির মধ্যে আছে প্রাণের প্রাচুর্য্য, সজীবতার লক্ষণ ইহার অক্ষরে অক্ষরে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে ভ্রাতৃপ্রেমনীতি আলোচনা কল্পে আমরা ঐশ্বরিক প্রেম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, এই অধ্যায়ে আমরা ইহার বিশদ আলোচনা কবিতে প্রয়াস পাইব।

ঐশ্বরিক তত্ত্বের আলোচনার প্রারম্ভে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে 'ঈশ্বর কি' এবং 'কে'।

জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থে 'ঈশ্বর কি' এবং 'কে' এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং অল্পবিস্তর এই সমস্যার সমাধানও করিয়াছে। আমাদের দেশের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান, ষড়ৈশ্বর্য্যশালীরূপে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর চৈতন্যময়, অনাদি, অনন্ত, অপার। জগতের প্রতি জড় ও জীবন্ত দেহের অণু পরমাণুর সহিত তাঁহার সত্তা ও তাঁহার অস্তিত্ব বিজড়িত।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির অবিশ্রান্ত আলোড়নের মধ্যে মন্থনদণ্ডের মত তিনি ধ্রুব ও স্থির। তিনি সর্ব্বময়, তিনিই জগতের আদি ও অন্ত। তাঁহারই পুণ্য অংশ হইতে সমগ্র জাগতিক প্রাণীর উৎপত্তি। আমরা তাঁহারই অংশ, আমাদের কোন অস্তিত্ব বা পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। তৃণাদপি তুচ্ছ বস্তুকেও সেই পরমবৃহৎ অস্তিত্ব হইতে পৃথক্‌রূপে কল্পনা করা যায় না।

আমরা তাঁহারই অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি বলিয়াই তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া বহুদূরে অবস্থান করিতে পারেন না, আমাদের মধ্যেই তাঁহার অবস্থিতি। আমাদের মধ্যে বিরাজমান তাঁহার অস্তিত্ব-সত্তাটুকুকে তাঁহারই চরণতলে নিবেদন করিয়া আমরা ধন্য হইয়া যাই। সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্যময় পরমেশ্বর অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নীতিনিচয়ের সাহায্যে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার বিচারালয়ের এই আইনকানুন সমূহের ব্যতিক্রম বা অপপ্রয়োগ কেহ কখনও দেখেন নাই এবং দেখিতেও পারেন না। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সসাগরা ধরিত্রীর পুঞ্জীভূত শক্তি ও তেজের আধার; তিনি মহাসমুদ্র, এই সমুদ্র হইতেই নদনদী প্রভৃতি ছোট বড় জলাশয় সমূহ জীবনবারি লাভ করিয়া আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

মানুষ তাহার কর্ম্মস্বরূপ ভালমন্দ ফলাফল ভোগ করিবেই। যে ব্যক্তি কর্ম্মকেই জীবনের প্রধান ধর্ম্ম স্বরূপ অবলম্বন করিয়া

সে নিজেকে ভুলিয়া যায়, সে অতি তুচ্ছ পদার্থের মধ্যেও সর্ব্ব-চৈতন্যময়ের অনুকম্পা দেখিতে পায়। দেখিতে পায় বলিয়াই তাহার নিকট সমগ্র পৃথিবী ভ্রাতৃত্বের মধুময় বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়। তাহার আত্মজাগরণের প্রেরণার মধ্যে নিহিত থাকে দুঃস্থ দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি, বুভুক্ষিতের ক্ষুন্নিবারণের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ। নিজেকে তিনি নিঃশেষে বিলাইয়া দেন ভাইয়ের দুঃখবিমোচনের জন্য। ভাইয়ের হাসিমুখ দেখিতে পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট, তিনি তৃপ্ত।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে মানুষ স্বকৃত কার্য্যের নিমিত্ত এই ধরাধামেই যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মানুষ তাহার কর্ম্মের জন্য দায়ী, তাহার জন্মের জন্য নয়। মানুষ হইয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন কর্ম্ম আমাদিগকে করিতেই হইবে। সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া দিন গণনা করিলে আমাদের চলিবে না। সুযোগসুবিধা বলিয়া কোন কথা ইহজগতে নাই।

সুযোগ-সুবিধা আমাদেরই হাতে গড়া কলমাত্র—আমা-দের ইচ্ছানুসারেই উহারা আসিবে, যাইবে এবং শুধু আমাদেরই ইঙ্গিতে উহারা ভৃত্যের ন্যায় আমাদের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইবে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি একই উৎস হইতে তেজ, কর্ম্মের প্রেরণা, অনুভূতি, বিবেকবুদ্ধি ইত্যাদি পাইয়া থাকে। সুতরাং যে কর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব তাহা অপরের পক্ষেও সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে

আত্মজাগরণের একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় মানুষ তাহার লুপ্ত শৌর্য্য-বীর্য্যের সন্ধান পায় না।

ব্যক্তিবিশেষ কোন অনন্যসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিলে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনেক সময় বলিয়া থাকি, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ উহার উপর পূর্ণ মাত্রায় বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে ঐরূপ ক্ষমতার অধিকারী আমরাও হইতে পারি। আবার যখন ব্যক্তি-বিশেষে কোন কুকার্য্য করিয়া তাহার সমুচিত শাস্তি ভোগ করে, আমরা স্বভাবতই তাহার নিকট হইতে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া সরিয়া দাঁড়াই,—যেন মনুষ্যত্বের দাবী উহার চেয়ে আমাদের অনেক বেশী। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে মানুষ তাহার কর্ম্মাগত ফল ভোগ করিবেই। এবং কর্ম্মানুসারে এই ধরাতলেই স্বর্গীয় অনুপম জ্যোতির অধিকারী হইবে অথবা মনের তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া এখানেই স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিবে। তাই কবি গাহিয়া গিয়াছেন—

"কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।"

সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের ভিতর দিয়াই আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া লন। আমাদিগকে এই সত্য মানিয়া লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তিনি পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন করিতে আমাদিগকে সৃজন করেন নাই; আমাদের সৃজন তাঁহারই বৃহৎ সৃষ্টিকে সঞ্জীবিত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত।

আমাদেরই সাহায্যে তাঁহার মঙ্গলময় করুণা-ধর্ম্মকে সর্ব্বজীবের মধ্যে সঞ্চার করিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যখন আর্ত্তের দুঃখবিমোচন করিতে সমর্থ হই, যখন নিঃশেষে পরহিতব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি, যখন অপরের অভাবের বোঝা মাথা পাতিয়া লই, তখনই আমরা ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও ঐশ্বরিক কল্যাণধর্ম্ম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং নিজেদের সেই পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া ধন্য হই। ভগবানের সৃষ্ট এই দেহ তাঁহারই তেজের, তাঁহারই জ্যোতির রক্তমাংসময় প্রকাশ। আমরা আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া আমাদের হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া এই পুঞ্জীভূত তেজের শক্তিকে দৃঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্ম্ম করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহাদের প্রকৃত ব্যবহারেই আমাদের জীবন সর্ব্বাঙ্গীণ চরিতার্থতা লাভ করে। ইহাদের অপব্যবহারে জীবন প্রকৃত সুখ শান্তি হইতে বঞ্চিত হয়, জীবন-ব্রতের উদ্‌যাপন কখনও সম্ভবপর হয় না। ক্ষমতার এই অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ হইতেই বিকৃত ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং উহা কর্ম্মের প্রেরণা ও কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিয়া দেয়। নীতির ব্যতিক্রম হইতে কেহ কখনও দেখে নাই। এই প্রাকৃতিক স্বভাব সুন্দর নীতির বিরুদ্ধে যখন আমরা অভিযান করি, তখনই আমাদের জীবন বিষময় হইয়া উঠে, আমাদের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমূহ ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

ভগবানের সেবা কেবল বুভুক্ষিতের, দরিদ্রের ও নিপীড়িতের সেবার দ্বারাই সম্ভব। যে ব্যক্তি দরিদ্র নর-নারায়ণের সেবায় কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরসেবার দাবী করে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ও প্রবঞ্চক। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং সমস্ত কর্ম্মের ভিতর 'সেবাকর্ম্মই' শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করিবার যোগ্য। 'সেবাকর্ম্মের' দ্বারা আত্মজাগরণ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব এবং সম্ভব বলিয়াই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ এই নীতিকে মানিয়া লইয়া প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

গীতা অধ্যয়নে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি। গীতার প্রতিটি পংক্তি, প্রতিটি অক্ষর, প্রেম ও সেবার অমৃতময়ী বাণী ঘোষণা করিয়াছে; বস্ত্রহীনের বসন যোগাইতে, বন্ধুহীনের বন্ধু হইতে, ভগ্নহৃদয়ের অন্তরে উৎসাহবারি সেচন করিতে, পতিতের হাত ধরিয়া নিজের পার্শ্বে উপবেশন করাইতে, পুনঃ পুনঃ উদ্দাপনা দান করিয়াছে এই গীতা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জীবনযাত্রা-প্রণালীর ভিতর দিয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মত সেবাপরায়ণ ও প্রেমময় হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারই মত দরিদ্র নর-নারায়ণের সেবা করিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব-লাভের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। এক কথায় সমগ্র গীতার সারমর্ম্ম এবং বীজমন্ত্র 'প্রেম' ও 'সেবা'। প্রেম ও সেবাকেই গন্তব্যস্থল মনে করিয়া কর্ম্মের সাহায্যে মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।



দীন-দরিদ্র-অনাথের বন্ধু বীরসাধক শ্রীবিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"আর কিছুতেই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও অসহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ—উন্নতি। উন্নতির অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনগতি-নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু। পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ, হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক।" (পত্রাবলী-১ম ভাগ)

"ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই। তোমরা কি মানুষ-জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র দুঃখী দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কুপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্ব-

শক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও, নাম যশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হইবে? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত! তাহা হইলেই তুমি সর্ব্বশক্তিমান হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তিকে কে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করিতে পারেন! তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও।" (পত্রাবলী-২য় ভাগ)

প্রকৃত আত্মজাগরণচরিত্র-গঠনে প্রথম ও প্রধান সহায়ক। আত্মজাগরণশীল ব্যক্তি চৈতন্যস্বরূপ, ঐশ্বরিক ক্ষমতার পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী; ঈশ্বরের অস্তিত্ব সে স্বীয় সত্তার মধ্যে অনুভব করে এবং এই সার্ব্বভৌম অনুভূতির সাহায্যে জীবন পথের জটিল সমস্যাগুলি তাহার নিকট প্রাঞ্জল হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে আত্মপ্রবোধন হইলে মানুষ যে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, এই অনুভূতিতে কিছুমাত্র সংশয় থাকিবে না। আত্মপ্রবোধনের সাহায্যে মানুষের ক্ষমতা শৌর্য্যবীর্য্য যাহা কিছু সবই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে— স্বীয় সত্তা আবিষ্কার করিয়া মানুষের মন আবিষ্কারের তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এইরূপে আত্মপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বসমাজের সেবক হইয়া উঠিবে। বিশ্বপ্রেমের মাধুর্য্যে তাহার হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহার ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের অবসান করিয়া দিবে। তাহার ক্ষুদ্র কুটীর আঙ্গিনায় সমগ্র বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হইবে।

জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্বের অখণ্ড বন্ধন সৃষ্টি করিয়া, প্রতি সমাজ প্রতি অনুষ্ঠান প্রতি প্রতিষ্ঠান বিশ্বজগতের জ্ঞানসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া দশের তথা দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব্ব প্রেমগীতিকা সহস্রকণ্ঠে গীত হইয়া থাকে, এইভাবে আত্ম-জাগরণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের অবসর দেয়, একে অন্যের গুণাবলী সম্যক সমালোচনা ও উপলব্ধি করিয়া নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারে, ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানুষ সহজ সরল গতিতে জীবন আহবে ফুৎকারে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে।

আত্মজাগরণের সাহায্যে প্রাচীন মুনি ঋষিরা ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের আভাষ পাইতেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে নিজেদের প্রস্তুত করিয়া লইতেন। পূর্ণ যৌবনোচিত স্বাস্থ্য লইয়া কেহ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। রোগের অসহনীয় যন্ত্রণা দেহকে বিকল করিয়া দিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রাকৃতিক নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহার শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে—রোগের অসংখ্য জীবননাশক বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে ধ্বংসের পথে চালিত করিবে। প্রাকৃতিক নীতি-ভঙ্গ আমরা জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া করিয়া থাকি। কিন্তু আত্ম-প্রবুদ্ধ মনীষীদের মধ্যে এমন ক্ষমতা প্রচ্ছন্নাবস্থায় নিহিত থাকে যে তিনি এক

মুহূর্ত্তের জন্যও রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করেন না। প্রাচীন দেবকল্প ঋষিদের জীবনেতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। এই সমস্ত আত্মব্যবকরণশাল মহাপুরুষদের নৈতিক জীবনের মূল এত সুদৃঢ় ছিল যে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিধি-নিয়ন্ত্রিত নীতির অপপ্রয়োগের অবকাশ তাঁহাদের জীবনে আসে নাই। এই নিমিত্তই তাঁহারা পরমার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, স্বার্থান্ধতার কলুষিত দৃষ্টি হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া সচ্চিদানন্দের পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ঐ সমস্ত প্রাচীন দিনগুলিকে কেন আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারিব না? এই একই ধরাতলে একই সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রাদির আলোকে তাঁহারা দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। সেই একই জীবন রসে আমাদের জীবন সঞ্জীবিত হইয়া আছে; একই বিধি-নিয়মের কর্ত্তৃত্বাধীনে আমাদের গমনাগমন করিতে হইতেছে, অথচ আমরা বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। যে পরমেশ্বর প্রাচীন ঋষিদের প্রতি করুণা করিয়াছিলেন সেই পরমেশ্বরই আমাদের করুণা করিতেছেন, তথাপি অজ্ঞানতিমিরে আমরা আচ্ছন্ন। হয়তো বা কেন, নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের চিনিতে ভুলিয়া গিয়াছি, নিজেদের চিন্তাশক্তির সম্যক পরিস্ফুরণে অপারগ হইয়া আমরা পূর্ণ আত্ম-পরিচয় লাভ করি নাই। পৈতৃক অধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত চিন্তা শক্তির অপপ্রয়োগ করিয়াছি বলিয়াই আজ আমরা দুঃখকষ্টের তীব্র অসহনীয় দংশনে জর্জ্জরিত হইয়াছি। জাতির অধঃপতনের

দ্বার রুদ্ধ করিতে হইলে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ চিন্তাশক্তির পুষ্টি সাধন করিতেই হইবে। চিন্তাশক্তি আমাদিগকে সৃষ্টিশক্তি অর্পণ করিয়া জগতের নূতনতর উন্নতির কল্পনা করিতে সাহায্য করে। বিশ্বনিয়ন্তার অন্তরে প্রথমতঃ তাঁহার বিশাল সৃষ্টির অস্পষ্ট একখানা ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং এই ছবিই সৃজনীশক্তির খাদ্যভাণ্ডার হইতে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বিশাল জগতে পরিণত হইয়াছে। জগতের যত কিছু আমরা দেখিতে পাই, ইহারা সকলেই অনুভূতির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি হইতে পুষ্টিলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহারা আকারে পরিণত হইয়া লোক গোচরে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদ, কুটীর, মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা প্রভৃতি সমস্তই শিল্পীর অনুভূতি-প্রসূত সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তি। প্রত্যেক প্রস্তর-মূর্ত্তি, প্রত্যেক যন্ত্রকৌশল যথাক্রমে ভাস্কর ও আবিষ্কর্ত্তার চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। চিন্তাশক্তির দ্বারা মন কোন কিছুর কল্পনা করিয়া ঐ আদর্শকে রূপ দিতে চেষ্টা পায় এবং পরিশেষে মানসিক মন ও দৈহিক শক্তির বলে তাহাকে পরিমূর্ত্ত করিয়া যন্ত্র ইত্যাদির আবিষ্কার করিয়া থাকে। এই সত্য মানব-পরিকল্পিত সমস্ত সৃষ্টির ইতিহাসের বেলাতেও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। মন সমস্ত শক্তির আধার, মানবদেহের প্রধানতম চৈতন্যময় অংশ মন। মন হইতেই সুখ দুঃখ ইত্যাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, মনের সংপ্রসারণে মানবজীবন মধুময় হইয়া উঠে ; মনই মানুষকে আধ্যাত্মিক চৈতন্য দান করে। স্বতন্ত্র

জীবন বলিয়া কিছুই নাই। সেই পরমব্রহ্মের আংশিক অভিব্যক্তি ব্যতীত মানুষের স্বকীয় বা ব্যক্তিগত জীবন আর কিছুই নয়।

আমরা প্রত্যেকেই জলমধ্যে মীনের মত চিন্ময় জগতে বাস করিয়া থাকি। আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী চিন্তাশক্তির দ্বারাই গঠিত, চিন্তা মস্তিষ্কের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়াই শব্দ-তরঙ্গের ন্যায় চিন্ময় জগতের অনন্ত আকাশে মুক্ত বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়। জাতির প্রতি জাতির আকর্ষণ এই বিশ্বপ্রকৃতির মহানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতির প্রতি জাতির আকর্ষণ—বিশ্বপ্রকৃতির এই মহানীতির সহিত চিন্তাশক্তির নীতিও সমসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষও স্বীয় স্বীয় পরিস্থিতি অনুসারে ঈপ্সিত বস্তুর আকর্ষণ করিয়া থাকে। একই জমিতে গোধূম ও তৃণ পাশাপাশি জন্মিতেছে, একই জমির খাদ্যরস গ্রহণ করিয়া গোধূম গোধূম-শস্য উৎপাদন করিতেছে, আর তৃণ তৃণবীজ উৎপাদন করিতেছে। একই খাদ্যে বিভিন্ন জিনিষের উৎপত্তি, গোধূম ঐ জমি হইতে খাদ্যরস গ্রহণ করিয়া উহার সাহায্যে গোধূম শস্যই উৎপন্ন করিয়াছে আর তৃণ এবম্বিধ উপায়ে তৃণ বীজই উৎপন্ন করিয়াছে ; ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। যে চিন্তা জীবরাজ্যের অন্তরের গভীর সোপান-কোণে লুক্কায়িত থাকে উহার বহিঃপ্রকাশের অক্লান্ত শ্রম হইতেই পদার্থের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ জাতি অনুরূপ চিন্তাশক্তির সাহায্যে আপন আপন সত্তা বজায় রাখিতে যত্নবান হইবেই—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

চিন্তাশক্তি মানবজীবনের ভিত্তি এবং চিন্তাশক্তিই তাহার কর্ম্মশক্তির মূল উৎস। সৎপথে থাকিয়া সৎচিন্তা করিলে জীবন শোভন, শুচি ও স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিবে, জীবনের চরম পরিণতিতে পৌঁছাইতে বেগ পাইতে হইবে না। অসদ্ চিন্তার ফলে জীবনের গতি বিপথে চালিত হইয়া জীবন শ্রীহীন, কুৎসিত ও বিষময় হইয়া উঠিবে; জীবনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া ধ্বংসের পথে অবতরণ করিতে হইবে। প্রেমের সুধায় মনন-শক্তিকে আভিষিক্ত করিয়া দিলে জীবন সুধাময় হইয়া উঠে।

জগৎকে ভালবাস, জগৎও তোমাকে ভালবাসিবে, জগৎকে ঘৃণা কর, জগৎও তোমাকে ঘৃণা করিবে। যেরূপ ব্যবহার করিবে বিনিময়েও অনুরূপ ব্যবহার পাইবে। মানুষ স্বরচিত আবহাওয়াতেই বাস করিয়া থাকে এবং এই আবহাওয়ার সৃষ্টি মানুষের আপন আপন মননশক্তির উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এইরূপে প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক পরিবার, আপন পটভূমিকার সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে বাস করিয়া থাকে। যে মুহূর্ত্তে সে ঐ আবহাওয়ার মধ্যে উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বীয় মননশক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

—সন্ধান—

চিন্তাশক্তির গতি জগতের কোন বাধাবিঘ্নই প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় না, পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইহা নিজের গন্তব্য স্থলে পৌঁছিবেই। চিন্তাশক্তির সূক্ষ্ম অন্তরে সন্দেহের বা ভয়ের লেশমাত্র নাই এবং এই কারণেই জগতের প্রকৃত চিন্তাশীল মানব অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে পারিয়াছেন।

মহাত্মা নিউটন তাঁহার মৌলিক গবেষণা প্রমাণ করিতে গিয়া বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার ঈপ্সিত তত্ত্বলাভের চিন্তা হইতে বিরত হন নাই, তাঁহার সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ আজ বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

যদি কেহ স্বকীয় উন্নতির আশা হৃদয়ের গভীরতম কোণে পোষণ করিয়া চিন্তাশক্তির সুধারসে উহাকে সঞ্জীবিত করিয়া উদযাপনের পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহার ঈপ্সিত ধনলাভ অবশ্যই হইবে, পারিপার্শ্বিক কোন প্রতিকূল অবস্থা তাহার বিজয় অভিযানের গতি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। উচ্চাভিলাষ যে আমাদিগকে উন্নতির পথে চালিত করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু শুধু উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়া অলসের ন্যায় ভাগ্যদেবীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া

থাকিলে চলিবে না। উচ্চাভিলাষ, মনন-শক্তি ও কার্য্যকরী শক্তির যথার্থ সমন্বয়ে অভীপ্সিত বস্তুর সন্ধান মিলিয়া থাকে এবং এই ত্রয়ীর সমবায়-শক্তির প্রভাবে মানব আত্মোন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া জীবনের আদর্শকে জগৎসভায় উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। চিন্তা ও কার্য্যকরী শক্তি দ্বারা জীবনের উচ্চাভিলাষ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গেলে নীতিনিচয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রাকৃতিক নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে আমাদের জয় সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে এবং মানবজীবনের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে আমাদের অনর্থক বিলম্ব ঘটিবে। প্রাকৃতিক নীতির অনুকূল বায়ুতে আমাদের জীবন-তরীর শুভ্রপতাকা জয়ের আনন্দাতিশয্যে উড্ডীয়মান হইয়া জগতে আমাদের আদর্শের বিজয় ঘোষণা করিবে।

জগতে কেহ দাসত্ব বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে আসে নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হইবার জন্যই সকলের মানবজীবন ধারণ। বিশ্বসংসার তাহার রত্নথালি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছে, যে ব্যক্তি প্রকৃত শৌর্য্যবীর্য্যের অধিকারী হইয়া উহার দাবী লইয়া বিশ্বদেবের দরবারে উপস্থিত হয় সে নিশ্চয়ই ফিরিবার সময় তাহার সোণার কলস পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া আইসে। বিশ্বপ্রকৃতি তাহার রত্নসম্ভার আমাদিগকে দান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন, শুধু আমাদের ইঙ্গিত পাইলেই তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।

আমাদের এই জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কোন কারণই আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবেই। আমরা অনেকেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী নই এবং প্রত্যেকেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিয়া থাকি। শুধু ইচ্ছা পোষণ করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে কার্য্য হইবে না; এই ইচ্ছা বা অভি-লাষকে চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকরী শক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া কর্ম্মযোগ অনুশীলন দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে; অন্যথা আমাদের দুঃখকষ্টের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গেই বিলীন হইয়া যাইতে হইবে। নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের অধিকারী আমরা ইহজীবনেও হইতে পারিব না।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা কৃতকার্য্য ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার প্রারম্ভে তাহার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র মনের ভিত্তিকে দৃঢ় করিয়া জীবন-সংগ্রামে নামিলেই তাহার জয় অনায়াসলভ্য হইয়া উঠে। লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া অন্যে যাহা করিতে না পারিবে, শুধু প্রকৃত আত্মজাগরণ ও মননশক্তির সমন্বয়ে তাহা সে করিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে। সে কেবল জয়ের স্বপ্ন দেখিবে—জয়ের আশাতেই সে দিবারাত্র সচেতন হইয়া থাকিবে। পরাজয়ের বা বিফলতার ছবি তাহার হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিফলিত হইবে না। নিত্য নূতন উদ্যমে সে সফলতার পথে অগ্রসর হইবে—পরাজয়ের অবসাদ তাহার হৃদয় স্পর্শ করিবে না।

ব্রাউনিঙের কথায় বলিতে গেলে প্রকৃত আত্মোন্নতিশীল মানব কেবল আত্মোন্নতির পথের পথিক হইয়াই মহাকালের আবর্ত্তচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে স্বীয় অভীপ্সিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবেই; প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সিন্ধুর বিশ্বগ্রাসী তাণ্ডবেও সে ভীত হইবে না, ভোগ লালসার মায়া-মরীচিকা তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না।

মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, ছলচাতুর্য্যের ও নীচবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনেক সময় তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। মনুষ্যত্বকে অবহেলা করিয়া প্রাকৃতিক শাশ্বত নীতির বিরুদ্ধ-কার্য্য করিয়া সে যে ধন লাভ করিবে তাহা তাহারই পাপহস্তের স্পর্শে একদিন ভস্মে পরিণত হইয়া তাহাকে অনুতাপের অনলে দগ্ধ করিয়া দিবে। পরমেশ্বরের বিজয় রথ সর্ব্বত্র সমগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহার বিরাম নাই। যে ব্যক্তি এই মঙ্গলরথের গতি প্রতিহত করিতে প্রয়াস পাইবে অথবা রথচক্রের সমান তালে না চলিয়া বিপথগামী হইবে, সে চক্রের নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

ইচ্ছাবৃত্তি সংযত হইলে চিন্তাশক্তিকে পরিচালিত করিয়া চিন্তাধারাগুলির বহিঃপ্রকাশে প্রভূত সাহায্য করিয়া থাকে। এইরূপ না ঘটিলে সে বিশ্বনীতির প্রকৃত পরিচয় পাইবে না, অবিদ্যার মোহজাল ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্তা কখনও আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত বক্তব্য হইতে আমরা দ্বিবিধ ইচ্ছাবৃত্তির সন্ধান পাই। ইহাদিগকে আমরা মানবীয় এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছা-বৃত্তি

নামে অভিহিত করিব। মানবীয় ইচ্ছাবৃত্তি সাধারণতঃ ঐশ্বরিক ভোগপ্রবৃত্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছাবৃত্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন না করিয়াই স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকে।

ঐশ্বরিক ইচ্ছাবৃত্তিই আমাদের চিত্তের সূতিকাগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মসন্ধানে ব্রতী হয়। এই ইচ্ছাবৃত্তি আমাদিগকে কখনও ভ্রান্ত পথে চালিত করিবে না, দুঃখকষ্টের ঘূর্ণিপাক ইহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই ইচ্ছাবৃত্তিকে আমরা কিরূপে আয়ত্ত করিব? এই ইচ্ছাবৃত্তিকে লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং প্রকৃত আত্ম-জাগরণের সাহায্যে সেই অসীম প্রেম ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের অর্গল মুক্ত করিয়া, ভূমার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া তাঁহারই অখণ্ড আত্মার মধ্যে নিজেদের নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। এই ভাবে অবিদ্যা দূর করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে জীবন-সংগ্রামে আমরা কখনও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইব না, ঐশ্বরিক ক্ষমতা আমাদের মধ্যে চিরজাগরূক থাকিয়া আমাদিগকে আত্মসন্ধানের পথ আবিষ্কার করিতে সহায়তা করিবে।

এইরূপে আত্মসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়া যখন আমরা পরমেশ্বরের আত্মার সহিত মিলিয়া যাই, যখন এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকে না, তখন আমরা প্রকৃত প্রেম ও জ্ঞানের সাহায্যে সমগ্র জগৎকে চিনিতে সক্ষম হই, জগতের তুচ্ছ জিনিষকেও

আপনার বলিয়া মানিয়া লইতে পারি, কোন বাধাবিঘ্নই আমাদের বিজয়াভিযানের গতি রোধ করিতে পারে না; গন্তব্য স্থলে আমরা পৌঁছিবই। মানুষ ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যখন জ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যা দূর করিতে সক্ষম হয়, যখন সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া সমগ্র মহামানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, যখন সে অন্তহীন জীবন-সত্তার অনুভূতি লাভ করে, তখনই তাহার জীবন ব্রতের প্রকৃত উদ্‌যাপন হইয়া থাকে; এক কথায় সে 'আত্মসন্ধানে' কৃতকার্য্য হইয়া মানব-জীবনকে ধন্য করে।

এই সত্যের অনুভূতিতে কুণ্ঠা, দ্বিধা, সঙ্কোচ, ভীতি, কাপুরুষতা ইত্যাদি মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্নসকল দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে বিশ্বাস, শক্তি ও আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস-শক্তির সাহায্যে অতীতের এবং ভবিষ্যতের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া বর্ত্তমানের পূজারী হইতে আমাদের বেগ পাইতে হয় না। অভীষ্ট কার্য্যের প্রারম্ভে এবং উদ্‌যাপনের মূলে রহিয়াছে চিন্তাশক্তি। কার্য্যের পুনরভিনয় হইতে অভ্যাস, অভ্যাস হইতে চরিত্র, এবং চরিত্র হইতে মানবজীবনের ঈপ্সিত ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যত্ব-বিকাশের জন্য 'উপাসনার' প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এই বিষয়ে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি ধর্ম্মানুরাগ জন্মাইয়া মনের বিভিন্ন বিপথগামী চিন্তাধারাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সীমা পরিচ্ছিন্ন আমাদিগকে

সেই অসীমের মহিমার সহিত মিশাইয়া দেয়। এই মিলনই মানবজীবনের পরমেষ্ট ধন। ইহার দ্বারা মানুষ স্বকীয় বৃত্তির পরিস্ফূরণে কৃতকার্য্য হইতে পারে। প্রমত্ত মনকে একাগ্রতার আসনে বন্ধন না করিলে সে অস্থির হইয়া দিক্‌বিদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইবে—মানব জীবনের সমস্ত শক্তির অপচয় ঘটিবে।

ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি মনের ঊর্দ্ধমুখী সহজ সরল অভিলাষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপাসনার ভিতর দিয়া আমরা আমাদের অভাব অভিযোগের কথা পরমেশ্বরের কাছে নিবেদন করিয়া থাকি এবং উপাসনার সাহায্যেই আমাদের কর্ম্মশক্তির উপর দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে।

এইরূপে আত্মবিশ্বাসী হইতে পারিলে নিজেদের চিনিতে আমাদের বেশী বিলম্ব হইবে না এবং আমরা 'আত্মসন্ধান'-বিষয়ে সাফল্য-লাভ করিব। আত্মবিশ্বাসই সন্ধানের পথে চালিত করে। পরমেশ্বর মানব-জীবনের অভাব অভিযোগ, অভিলাষ ইত্যাদি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের প্রতিকার বা সার্থকতা লাভ করিবার বিভিন্ন পথও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমরা চিন্তাশক্তির বিভিন্ন ধারাকে এক-কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হই, তখনই আমাদের সত্তা অসীমের সহিত মিশিয়া যায়—আত্মোন্নতির পথগুলি আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হয়।

ভগবান তাঁহার সৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহার কল্যাণময়ী প্রকৃতির সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। মানুষ কেবলমাত্র উপলক্ষ হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া

যায়। প্রয়োজনানুসারে তিনি মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহাকে অফুরন্ত শক্তিসম্ভারে সজ্জিত করিয়া দেন, আবার প্রয়োজনানুসারে তাহার নিকট হইতে সমস্ত শক্তি অপহরণ করিয়া তাহাকে নিশ্চল ও অসাড় করিয়া দেন। যখন আমরা তাঁহার প্রকৃত সেবক হইয়া দাঁড়াই, তখনই তিনি তাঁহার অসীম সত্তার সহিত আমাদিগকে মিলিত করিয়া দেন, আমরা আত্ম-চৈতন্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়া যাই। তাঁহার নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে আমাদিগকে শাস্তি পাইতেই হইবে—অজ্ঞান অন্ধকারে আমাদের জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে।

এইরূপে আত্মপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি তাহার :আভ্যন্তরিক নৈতিক-বলের সাহায্যে নিজেকে নিঃশেষে পরহিতব্রতে বিলাইয়া দিতে সক্ষম হইবে; পরের মঙ্গল-কামনাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিবে, নিজের বলিতে তাহার কিছুই থাকিবে না, জগৎ সুখী হইলেই সে সুখী, সে পরিতৃপ্ত, স্বীয় স্বর্গীয় শোভা-মণ্ডিত ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া সে জগৎ সেবার স্বপ্ন দেখিবে এবং স্বপ্নকে তাহার সিদ্ধিপ্রসূত ফলদ্বারা কার্য্যে পরিণত করিবে, জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া না বেড়াইলেও তাহার চলিবে। চিত্ত পরহিতৈষণায় মধুর প্রেমময় ভাবে পূর্ণ হইলেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন আত্মপ্রবুদ্ধ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মুনিঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, "নিজের জন্য এই মরজগতে রত্নরাজি সঞ্চিত করিও না। কালের রথচক্রের নিষ্পেষণে সে ঐহিক রত্ন চূর্ণ

হইয়া যাইবে ; চোর ডাকাত ইত্যাদি উহা অপহরণ করিয়া লইবে। এমন কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জ্জন কর, যাহার ক্ষয় কোন কালেই হইবে না, চোর ডাকাত যাহার কিছুই করিতে পারিবে না।”

সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম পোষণ করিয়া ও সেবাপরায়ণ হইয়া জগৎবাসীকে প্রেমের বাণী শুনাইয়া সেবাধর্ম্মের মধুর স্পর্শে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে আমরা প্রকৃত ঋদ্ধি লাভ করিব। চোর ডাকাত ইহা অপহরণ করিয়া লইতে পারিবে না। পরহিতব্রতে যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেয়, সেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায়, অন্যথা অবিদ্যার কলুষস্পর্শে তাহার জীবন ঘৃণ্য হইয়া উঠিবে, সার্ব্বজনীন নীতির অভাবে, তাহার জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ হইবে না, মনুষ্যত্বের বিকাশ তাহার মধ্যে কখনও সম্ভবপর হইবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করে, সে কখনও অপরের নিন্দাস্তুতিতে কর্ণপাত করে না। নিজের বিবেকবুদ্ধির অনুপ্রেরণায় সে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়—তাহার কার্য্যকলাপের বক্র সমালোচনা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে ত নিজের স্বার্থের জন্য জগৎকে সেবা করিতেছে না, সমগ্র বিশ্বকে সেবা করিতে হইবে, তাই সে বিশ্বসেবক হইয়াছে, নিজের বলিতে ত তাহার কিছু নাই,—নাই বলিয়াই সে সর্ব্বচৈতন্যময়ের বিভূতির মধ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র সত্তাকে নিমজ্জিত করিয়া সর্ব্বচৈতন্যময়ের ইচ্ছা পূরণ করিয়া যাইতেছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের আনন্দ, জয়ের পরিতৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে, আবার জয়ের মধ্যেও পরাজয়ের গ্লানি থাকে এবং জয়ের আনন্দময় উৎসবকে নিরানন্দে পরিণত করে। স্পার্টানবীর লিওনিদাসের পরাজয়, বা রাজপুতবীর রাণা প্রতাপের পরাজয় জগতের ইতিহাসের সকল জয়কে কি ম্লান করিয়া দেয় নাই? রাণী দুর্গাবতী নিজে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন—চাঁদসুলতানা শেষ পর্য্যন্ত আহমদনগর রক্ষা করিতে পারেন নাই—উভয় ক্ষেত্রেই ভারতেশ্বর আকবরের বিশাল-বাহিনী জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই জয়ে কি গৌরব আছে? যুবকদিগকে এইরূপ সাফল্য-মণ্ডিত পরাজয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইলে ইহাতে তাহারা তাহাদের নিজস্ব ক্ষমতা, শৌর্য্যবীর্য্যের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে জগৎসেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবে এবং জগতের ত্রাণকর্ত্তারূপে বিদ্যমান থাকিয়া পরবর্ত্তী বর্দ্ধিষ্ণু জাতিকে প্রেম ও সেবামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইতে সক্ষম হইবে। এই ভাবে পরাজয়ের ভিতর দিয়াও মানুষ তাহাঁর যশঃপ্রদীপ চিরপ্রজ্বলিত রাখিতে পারে। জয়ী হও আর পরাজিত হও পরমেশ্বরের বীর সন্তানের ন্যায় তুমিও প্রেম ও সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশের তথা সমগ্র জগৎবাসীর সেবা করিয়া যাও, তোমার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

পরমাত্মার সহিত তোমার আত্মার মিলনরাখী কেহই ছিনাইয়া

লইতে পারিবে না। বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃবন্ধনে বাঁধিতে পারিলেই তোমার জীবনব্রতের উদ্‌যাপন হইবে। তোমার কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময়ী গীতিকা জয়ের আনন্দে আকাশ, বাতাস, পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। সার্ব্বভৌমের স্বর্গীয় শোভা তোমাকে অবিনশ্বর স্বর্গের দ্বার দেখাইয়া দিবে—সর্ব্ব-মঙ্গলময়ের শান্ত শীতল পাদমূলে চিরবিশ্রামময় শিবিরে তোমার বিজয় অভিযানের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

ওঁঃ শান্তি ওঁঃ শান্তি

